কাল রেল-গাড়ী কিনে এনেছি...মোটর কিনে এনেছি...সে ভারী খুশী...

কমলা দেবী কহিলেন—তাই আজ একটিবারও আর আমার কাছে আসেনি! এই বয়সেই এমন পাষাণ!...খেলা পেয়ে মাকে ভুলে আছে!

কমলা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইন্দুশেখর বলিলেন,—না, না...তা নয়! তোমার কাছে দু'তিনবার এসেছিল খেলনা দেখাতে! তুমি চোখ বুজে শুয়েছিলে...গিয়ে আমাকে বললে, মা ঘুমোচ্ছে, বাবা...

কমলা দেবী কহিলেন—ঘুমুই নি...চোখ বুজে ছিলুম। অনেক কথা ভাবছিলুম...

কমলা দেবীর দু'চোখে বিষাদের মলিন ছায়া!

ইন্দুশেখর বলিলেন—ডাকবো প্রবীরকে?

কমলা দেবী কহিলেন,—থাক্...খেলা করছে। আমার কাছে এলে এমন করুণ-চোখে চেয়ে থাকে...একটি কথা বলে না...দেখে বড় কষ্ট হয়!...সেই-সব কারণে ভাবি দিন-রাত...যদি মরে যাই...ছেলেটার কষ্টের একশেষ হবে। এই বয়সে মা গেলে...

দু'চোখের কোণে জল উথলিয়া উঠিল...

সস্নেহে চোখের সে জল মুছিয়া ইন্দুশেখর বলিলেন,—ছি, ও-সব কথা ভাবতে নেই! সেরে উঠবে বৈ কি...নিশ্চয় সারবে। আমাদের এত সাধনা নিষ্ফল হতে পারে না, কমল...

কমলা দেবী সনিশ্বাসে বলিলেন—সেই কথাই বলো গো! তোমার ও কথা নয়...আশীর্ব্বাদ। যদি বাঁচি, তোমার আশীর্ব্বাদেই বাঁচবো!...

সরতে আমি চাই না...এত সুখ, এমন ভাগ্য...কত-জন্মের পুণ্যে...এ-সব ছেড়ে স্বর্গেও আমি যেতে চাই না।...

শেষ দিকটায় প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাগুলা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখের কোলে জলস্রোত বাঁধ মানিল না!

ইন্দুশেখর বলিলেন—আবার ঐ সব ধর্ম্ম-কথা নিয়ে আলোচনা! আমি তাহলে বাড়ীতে থাকবো না...অফিসে যাবো...কথ্খনো আর তোমার কাছে আসবো না...

সবলে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পোচ্ছ্বসিত স্বরে কমলা দেবী বলিলেন,—না, না,...দেখতে না পেলে আমি একদণ্ড বাঁচবো না। তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না। আমার বড্ড ইচ্ছে, সেরে উঠি!...এভাবে আর ভুগতে পারি না...নিজের কষ্ট তত নয়...সে কষ্ট গা-সওয়া হয়ে গেছে... তোমাদের দুজনের কষ্টের কথা মনে হলে আমাতে আর আমি থাকি না। সে কষ্ট কি অসহ্য, তা তুমি বুঝবে না!

ইন্দুশেখরের বুকের মধ্যটা ব্যথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতো হইল... কোনোমতে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন—আমি তা জানি কমল...খুব ভালো করেই জানি। তুমি চুপ করো...ভালো কথা বলো...আজ আমি অফিসে যাবো না। প্রবীরকে ডেকে আনি...তার সঙ্গে এসো, দু'জনে আমরা খেলা করি...কেমন?

প্রবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা দেবী ইঙ্গিতে কহিলেন, আচ্ছা!

বেলা তখন তিনটা। ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া কমলা দেবী ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিলেন। ঘরের মেঝের রেলোয়ে-লাইন পাতিয়া সিগনাল, ষ্টেশন সাজাইয়া প্রবীর খেলা করিতেছিল একাগ্র মনে···ইন্দুশেখরের মন হইতে বিশ্ব-নিখিল উবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল···মনে যেন পাথরের স্তূপ!

সহসা ভৃত্য আসিয়া কহিল, একজন সাহেব আসিয়াছেন মোটরে করে...

ইন্দুশেখর উঠিলেন...কমলা দেবীর পানে চাহিলেন। বিছানায় পড়িয়া আছে রূপের আভাটুকু...

হাত বাড়াইয়া কমলা দেবীর নিশ্বাস-বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিলেন... তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলেন।

সাহেব আসিয়াছে কলিকাতা হইতে। বড় এক বিলাতী অফিসের ম্যানেজার...বৈষয়িক পরামর্শ করিতে।

দু'চারিটা কথা কহিবার পর সাহেব বলিলেন,—একবার আধ ঘণ্টার জন্ত কলিকাতার অফিসে আসা প্রয়োজন...একটা বড় দলিল সহি করিতে হইবে!

ইন্দুশেখর বলিলেন—আমার স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা...

সাহেব বলিল—আমার মোটরে যাতায়াত...সেখানে আধঘণ্টার মধ্যে কাজ চুকিয়া যাইবে! কাল ভোরে রেঙ্গুন চলিয়াছি।

কমলা দেবীর কথা মনে পড়িল। কমলা দেবী বার-বার সচকিত করেন—মনিবের কাজে অবহেলা করো না—ছেলে হয়েছে। তার জন্ত অবহেলা চলবে না...তাছাড়া এতদিনের কারবার...আমার রোগ... এ তো নিত্যদিনের ব্যাপার...

ইন্দুশেখর কহিলেন—যাতায়াতে একঘণ্টা আর সেখানে আধঘণ্টা... দেড়ঘণ্টা !

সাহেব কহিলেন,—কোনো ভয় নাই—ভগবান দেখিবেন।

ভগবানের উপর কমলা দেবীর ভার দিয়া সাহেবের সঙ্গে ইন্দুশেখর বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু কলিকাতায় নানা উপসর্গ ঘটিল...ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

যখন ফিরিলেন, বাড়ীতে তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে...

পাগলের মতো ছুটিয়া ইন্দুশেখর আসিলেন একেবারে দোতলার ঘরে...

কমলাকে জড়াইয়া চার বছরের ছেলে প্রবীর কাঁদিতেছে,—মা... মা...মাগো...

চোখের জল মুছিতে মুছিতে উমা-পিশি বলিলেন,—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বাবা...এই বয়সেই আমার প্রবীরের কি হলো গো !

ইন্দুশেখরের মনে হইল, মেঝেয় মাথা ঠুকিয়া প্রাণটাকে এখনি বাহির করিয়া দেন ! কমল নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, আজ তার বিদায়ের দিন ! তাই জোর করিয়া সে তাকে কলিকাতায় যাইতে আজ মানা করিয়াছিল। বলিয়াছিল,—আজ অফিসে যেয়োনা...কাছে থাকো...সে নিষেধ ঠেলিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন !...হয়তো সে-ঔদাস্য কমলার বুকে প্রচণ্ড বাজিয়াছিল : তাই অভিমান করিয়া সে চলিয়া গেছে...

কোনোমতে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেল। ইন্দুশেখর যেন প্রাণহীন

পুতুল বনিয়া রহিলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে প্রবীরকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন...একটা ফ্ল্যাট বাড়ীর দোতলায় আস্তানা পাতিলেন প্রবীরকে মানুষ করিতে হইবে! তাঁর বড় সাধ ছিল...কারবারের কাজে আর অবহেলা চলিবে না...প্রবীরের মঙ্গলের জন্য...

প্রবীর আর কারবার—এ দুটি বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাই তিনি নিজেকে আবার খাড়া করিলেন...

ফরাশডাঙ্গার বাড়ীতে জীবনে আর পদার্পণ করে নাই। বলিতেন,—আমার জীবন ও-বাড়ীতে শেষ হইয়া গিয়াছে···বাড়ীর যে ঘরখানি হইতে কমলা দেবী বিদায় লইয়া গিয়াছেন, সে-ঘরে যেমন যাহা ছিল তেমনি রাখিলেন। কেহ যেন এতটুকু নাড়াচাড়া না করে—সাবধান!

তারপর কাটিয়া গিয়াছে বিশ বৎসর। প্রবীর বি-এ পাশ করিয়া কারবারে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দুশেখরের কর্ত্তব্য শেষ...তাঁর ডাক পড়িল...কমলা দেবী ডাকিয়াছেন—আর কতদিন একলা থাকিব? ছেলে মানুষ হইয়াছে...তাকে সব বুঝাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া এসো···

অফিসে কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা···সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুশেখর অচেতন হইলেন। চেতনা আর ফিরিল না!

প্রবীরকে বলিতেন,—আমি মারা গেলে আমার দেহ দিস্ ফরাশডাঙ্গায় শ্মশানের চিতায়···যে-চিতায় তিনি দেহ রাখিয়া গিয়াছেন! এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর নাই! ইন্দুশেখরের দ্বিতীয় আদেশ ছিল, আমি মারা গেলে তুমি গিয়া ফরাশডাঙ্গার বাড়ীতে বাস করিবে। সে

গৃহ সেই যে আমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে গৃহে আমি এ-জীবনে আর ফিরিব না ! তুমি ফিরিয়ো...তোমার মার বড়-সাধের সাজানো সেই গৃহ !

ইন্দুশেখরের এ-বাসনা প্রবীর পূর্ণ করিয়াছে। ইন্দুশেখরের মৃত্যুর পর সে আসিয়াছে ফরাশডাঙ্গার বাড়ীতে। এইখানেই তাকে বাস করিতে হইবে...বাপের আদেশ ! এ বাড়ী মায়ের স্মৃতিতে পূর্ণ পুণ্যতীর্থ।

কিন্তু এ বাড়ী তার কাছে অজানা নূতন...ঝাপ্‌সা কতকগুলা স্মৃতি মনের আশে-পাশে নক্ষত্রের মতো শুধু ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাশডাঙ্গার বাড়ী

কলিকাতা হইতে প্রবীণ ম্যানেজার নীলরতন সঙ্গে আসিয়াছেন। আর আসিয়াছে পুরানো ভৃত্য পঞ্চু।

প্রবীর একলা মানুষ। বাড়ীতে আত্মীয়-আত্মীয়া-পরিজন আছেন। তাঁদের মধ্যে দু'চারিজন কালে-ভাদ্রে কলিকাতার বাসায় গিয়া উঠিতেন; তাদের সে জানে। বাকী-সকলে তার কাছে প্রায় বিদেশী-অনাত্মীয়ের সামিল।

উমা দেবী আসিয়া প্রবীরের গলা ধরিয়া কাঁদিলেন—বাড়ী শ্মশান হয়ে আছে বাবা। এ শ্মশানে আবার তুমি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তোলো... আমি কায়-মনে আশীর্ব্বাদ করছি...

ম্যানেজার নীলরতন বাবু বলিলেন,—কর্ত্তার পিসিমা হন। তোমার ঠাকুমা...

প্রবীর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। উমা দেবী বলিলেন—আর প্রণামে কাজ নেই, ভাই...প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হয়ে সুখে ঘর-সংসার করো। ঘর-সংসার কাকে বলে, ভুলে গেছি দাদা। কি বলো নীলরতন, তুমি তো সব জানো!

উমা দেবীর চোখে জল আসিল। উমা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন।

নন্দর মা বলিলেন—আমি হলুম ইন্দুর মামী। তোমার মা ছিলেন আমার সমবয়সী। দুজনে একই বছরে এ-বাড়ীতে বৌ হয়ে ঢুকেছিলুম, দাদা...

চারিদিক হইতে পুরানো স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া চলিল। প্রবীর তাহার মাঝখানে নির্ব্বাক নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দুশেখরের কাছে কথায় কথায় এখানকার অনেক কাহিনী শুনিয়াছে। শুনিয়া অবধি তার মনে হইত, লোকালয়ের বাহিরে ফরাশ-ডাঙ্গায় আছে মায়া-পুরী...সে পুরীতে আছেন মা...যে-মায়ের কথা অস্পষ্ট আভাসে মনে জাগে! যে-মায়ের কথা শুনিতে সে তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে!...

পরিচয়ের পালা সারা হইলে প্রবীরকে লইয়া উমা দেবী ঘর দেখাইতে লাগিলেন। এ-ঘরে আনাজ-তরকারী রাখা হইত ডাঁই করিয়া...ও-ঘরে তুমি জন্মিয়াছিলে দাদা...এ-ঘরে তোমার বাবার-মার ফুলশয্যা হইয়াছিল...এ-ঘর তোমার বাবা তৈয়ার করাইয়াছিলেন, তোমার জন্ম হইলে তোমার গায়ে বাতাস লাগিবে বলিয়া! এ-ঘরের চারিদিকে বড় বড় খড়খড়ি, দক্ষিণে খোলা টানা-বারান্দা...ও-ঘরে তোমার মা দুপুরবেলায় বসিয়া সেলাই করিতেন...এ-ঘরে তিনি গান-বাজনা করিতেন...ওটায় থাকিত তোমার দাসী...

প্রবীর সব ঘর দেখিল। মস্ত বাড়ী...অনেক ঘর...যেন রাজ-পুরী! কিন্তু ব্যথার ভারে মূক মৌন! এ-ঘরে মায়ের হাসি, মায়ের বাণী এখনো যেন সঞ্চিত আছে! মন অধীর হইল। মায়ের একটু হাসি, একটা কথা...শোনা যায় না? শোনা এমনি অসম্ভব?

উমা দেবী বলিলেন—আর ঐ যে ঘর...দোরে চাবি...ঐ ঘর থেকেই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী চোখ বুজে বিদায় নিয়ে গেছেন। যেমন তিনি সব সাজিয়ে রেখেছিলেন, তেমনি আছে...ইন্দু তারপর ও-ঘরে জীবনে আর ঢোকেনি। দোরে তালা-দেওয়া...এ পর্য্যন্ত খোলা হয়নি। ইন্দু বলেছিল, প্রবীর বড় হলে যদি এ বাড়ীতে এসে বাস করে, তাকে বলো, সে যেন এই ঘরে থাকে...তার মায়ের গায়ের গন্ধ ও-ঘরে ধূপের ধোঁয়ার মতো ভরে থাকবে!...

উমা দেবীর দু'চোখে জল। চোখের জল মুছিয়া বলিলেন,—সতী-লক্ষ্মী! কিন্তু কি বরাত নিয়েই এসেছিলেন...স্বামী-পুত্র নিয়ে দু'দিন সুখভোগ করতে পেলেন না...

প্রবীর কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে পড়িল, অতি ক্ষীণ স্মৃতি। ঘর লোকারণ্য! ঐ ঘরে খালি বিছানায় ঝরা ফুলের মতো মায়ের সেই মূর্ত্তি! পাগলের মতো সে কাঁদিতেছিল...ঘরের সামনে ঐ বারান্দা...মা কোথায় চলিয়া গেলেন! পরের দিন ঘরের দ্বারে চাবি পড়িল! থাকিয়া থাকিয়া এই ঘরের সামনে ছুটিয়া আসিত...দ্বারে কাণ পাতিয়া থাকিত...যদি মায়ের স্বর শুনিতে পায়!

কি সে দারুণ বেদনা...

দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে সে শোক, সে বেদনায় মন অভিভূত হইয়া পড়িল...চোখের সামনে আলো যেন নিবিয়া আসিতেছিল...

প্রবীর বলিল—চলুন, ওদিকে যাই...

উমা দেবী বলিলেন—এ ঘরের চাবি আমার কাছে আছে, দাদা... যখনি বলবে, দেবো। চাবি খুলে ঘরে যাবে...মায়ের ঘর...ও তোমার মন্দির...

• • •

দুপুরবেলায় চাবি খুলিয়া প্রবীর একা ঘরে প্রবেশ করিল...

এ ঘরে চমৎকার একটি মিষ্ট গন্ধ! প্রবীরের মনে হইল, মা যেন বসিয়া আছেন...চোখে তাঁকে দেখা যায় না, তবু তিনি আছেন! তাঁর স্পর্শ এ ঘরের বাতাসে মিশিয়া আছে! ঐ সে খাট...খাটের পাশে ছোট আর-একখানি খাট...ছোট খাটে সে শুইত। ঐ বইয়ের আলমারি...বইয়ে ঠাশা। আয়না-দেওয়া ঐ বড় আলমারি! ও-আলমারিতে মায়ের কাপড়-চোপড় থাকিত...দেওয়ালে ঐ সব ছবি... রবিবর্ম্মার। ও-ছবিখানা যেদিন দেওয়ালে টাঙানো হয়,...মনে পড়িল, মা নিজের হাতে ফ্রেমের কড়ায় সোনালি তারের কর্ড পরাইয়া দিয়াছিলেন। শয্যা-শায়িনী মায়ের সামনে ঘরের মেঝেয় বসিয়া কতদিন খেলা করিয়াছে...মা গল্প বলিতেন...কত কথা কহিতেন! দেওয়ালের গায়ে ঐ বড় ঘড়ি...আশ্চর্য্য, বেলা পাঁচটা বাজিয়া থামিয়া গেছে!

পাষাণ

বেলা পাঁচটা...প্রবীর শিহরিয়া উঠিল। মা বিদায় লইয়াছেন বৈকালে বেলা পাঁচটা বাজিয়া বারো মিনিটের সময়...ঘড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে তার চলা শেষ করিয়া থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে। ও-ঘড়ি...

থাক্...ও-ঘড়ির আর চলিয়া কাজ নাই! ও-ঘড়ি জীবনের সব চেয়ে করুণ স্মৃতি এম্‌নি করিয়া বুকে ধরিয়া থাকুক!...

প্রবীর অনেকক্ষণ ঘরে রহিল। প্রাণে বেদনা হইতেছিল খুব...তবু সে-বেদনার সঙ্গে কি এক মধুর নিবিড় সান্ত্বনা...

সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রবীর ঘর হইতে বাহির হইল...বাহিরে ছিলেন উমা দেবী, নন্দর-মা প্রভৃতি।

উমা দেবী কহিলেন—ঐ ঘরে কি তোমার বিছানা হবে দাদা?

প্রবীর বলিল,—না। ও-ঘর এমনি চাবি-বন্ধ থাকুক...ও-ঘরের কোনো কিছু নাড়তে পারবো না। আমার সহ্য হবে না...

উমা দেবী কহিলেন—আহা!...

মাসখানেকের মধ্যে বাড়ী শ্রী ফিরিয়া গেল। বাবা ইন্দুশেখর বলিতেন,—বাড়ীটিকে ইন্দ্রপুরী করে তুলবেন, তাঁর ছিল সাধ!

মাকে স্মরণ করিয়া প্রবীর বাপের কথা রক্ষা করিল।

যে-বাড়ী খালি পড়িয়াছিল, দেশের লোক যে-বাড়ীর পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিত, পাঁচজনে বসিয়া যে-বাড়ীর কথা আলোচনা করিত,

সে-বাড়ীতে আবার দু'একজন করিয়া পুরানো আত্মীয়-বন্ধু আসিতে লাগিলেন।

সব চেয়ে সমাদর পাইলেন কৈলাস চাটুয্যে। কৈলাস ছিলেন ইন্দুশেখরের সহপাঠী বন্ধু। কাজেই কৈলাসের স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী ছিলেন কমলা দেবীর সখী, বান্ধবী।

কৈলাস চাটুয্যে পয়সাওয়ালা মানুষ। দেশের সব কাজে তিনি সকলের পুরোবর্ত্তী। হেমপ্রভা লেখাপড়া শিখিয়াছেন। অমায়িক নিরহঙ্কার প্রকৃতির সরল রমণী। কৈলাসের একটি মেয়ে—সুনীতি।

সুনীতি লেখাপড়া জানে, গান-বাজনা জানে। সুনীতি সুন্দরী। তার বয়স ষোল পার হইয়া সতেরোয় পড়িয়াছে। এখনো বিবাহ হয় নাই। কৈলাস এবং হেমপ্রভা আজো তেমন মনের মতো পাত্র পান নাই।

কৈলাস চাটুয্যে এবং হেমপ্রভা দেবী প্রবীরকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। হেমপ্রভা দেবী বলিলেন,—আমি তোমার মাসিমা হই... আমাকে মাসিমা বলো। মোটে দেখতে পেতুম না বাবা...কিন্তু তোমার কথা আমার মনে জেগে আছে চিরদিন।...এই বয়সে মা-বাপ হারিয়েছ —তোমার দুর্ভাগ্য আমি বুঝি, বাবা...আমিও অল্প বয়সে মা-বাপ দুই হারিয়েছি...

তাঁর চোখ বাষ্পসিক্ত হইয়া উঠিল। হেমপ্রভা ডাকিলেন—নীতি...

মায়ের আহ্বানে মেয়ে সুনীতি কাছে আসিল...যেন হাসির হিল্লোল!

মা বলিলেন—গান-পাগলা মেয়ে! গান নিয়েই আছে। যে-সব

কবিতা পড়ে, সেগুলোতে নিজে সুর দিয়ে গায়...তা কি ইংরিজি কবিত কি বাংলা কবিতা! কাল এই ঘরে বসে গাইছিল,—শেলির স্কাইলা‍‍ কবিতাটি...মন্দ সুর ভায়নি।

প্রশংসা শুনিয়া সলজ্জ হাস্যে সুনীতি মুখ নামাইল।

প্রবীর দেখিল।

প্রবীর কহিল,—একদিন গান শুনবো...

হেমপ্রভা কহিলেন—শুনবে বৈ কি...নিশ্চয় শুনবে।...আজই শোনো না...সময় আছে?

প্রবীর কহিল—আছে···

—তাহলে বসবে এসো, বাবা। এ-ঘর তোমার নিজের ঘর বলেই জেনো।...তোমার মার সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক ছিল,—কারো বাড়ী যেতো না...আসতো শুধু আমার এখানে। কোনো নতুন গান সে শিখলে তখনি আমার কাছে ছুটে আসতো...আমিও তেমনি নতুন গান শিখলে তার কাছে ছুটে যেতুম!...

হেমপ্রভা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন···তারপর চাহিলেন মেয়ের পানে। কহিলেন—প্রবীরকে নিয়ে যাও, গান শোনাও···ওর কাছে লজ্জা করো না। এখানে থাকে না, তাই—থাকলে তুজনে একসঙ্গে খেলাধূলো করতে···

সুনীতিকে আসিতে হইল এবং গান গাহিতে হইল: এক অজানা কবির লেখা গান।

প্রবীর কহিল—রবি বাবুর গান জানো না?

হেমপ্রভা কহিলেন—জানে বৈ কি।

প্রবীর কহিল—সেই গানটা জানো···পুরোনো গান···ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা ?

মাথা নাড়িয়া সুনীতি জানাইল, জানে।

প্রবীর কহিল—গাইবে ?

হেমপ্রভা কহিলেন,—গাও···

সুনীতি গাহিল—

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছো মিলায়ে পবনে-পবনে
কেন কিরণে-কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে-শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে-ছায়াতে
আছো লুকায়ে আপন-মায়াতে
মুরতি ধরিয়া চকিতে নাম না।······

প্রবীর শুনিল ..শুনিয়া মুগ্ধ হইল।

হেমপ্রভা কহিলেন,—তুমি গান গাও ?

প্রবীর কহিল,—গান আসে না...তবে গান আমি খুব ভালোবাসি ..

হেমপ্রভা কহিলেন—ভালোবাসা উচিত। তোমার মার গলা ছিল চমৎকার। যেমন উঠতো, তেমনি নামতো। তার গলায় রবিবাবুর সেই গান 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' আজও আমার কাণে লেগে আছে। ভোলবার নয়। এত লোকের মুখে ও-গান শুনেছি, কিন্তু

তোমার মা যে-রকম দরদ দিয়ে এ-গানটি গাইতেন, তেমন আর কারে গলায় শুনলুম না!

কথায় কথায় অনেক কথা হইল···তার মধ্যে মায়ের কথা বড় মধুর যে-মা স্বপ্নলোকে মায়াময়ী-বেশে জাগিয়া আছেন, হেমপ্রভার কথা সে-মাকে প্রবীর বড়-কাছে পাইল! বাপের মুখে মায়ের কথা অনে শুনিয়াছে—সে-কথায় মাকে মনে হইয়াছে, যেন মর্ত্ত্য-লোকের জী ছিলেন না···কোন্ মায়া-লোক হইতে আসিয়াছিলেন চকিতের জন্য সুরবালার বেশে···সে-মা মহিমাময়ী দেবী···সে-মাকে যেন ধরণীর ধূলা মাঝখানে আনিয়া দাঁড় করানো চলে না! চক্ষু মুদিয়া তাঁর ধ্যান করিত হয়! সে মাকে শুধু পূজা করিতে হয়···দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর মতো!

হেমপ্রভার কথায় সেই দেবী-মাকে আজ মানুষের মতো কাছে পাইয় প্রবীরের বুকের খালি-দিকটা মায়া-মমতায় ভরিয়া উঠিল!

সন্ধ্যা হয়-হয়...হেমপ্রভা কহিলেন,—কথায় কথায় ভুলে গেছি···ও সুনীতি, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো...চা, লুচি...

প্রবীর কহিল—না মাসিমা, চা আমি খাবো না। এ বেলায় চা খ না। আমি আজ উঠি।

—সে কি বাবা...কিছু না খেলে আমার মন মানবে কেন? দুখা লুচি ভেজে আনুক। সুনীতি যাও মা, বসে থেকে ঠাকুরকে দিয়ে ল ভাজিয়ে মাছের তরকারী করিয়ে এখনি আনো তুমি...

সুনীতি গেল মায়ের আদেশ পালন করিতে।

প্রবীর কহিল—সুনীতি কি পড়ছে ?

হেমপ্রভা কহিলেন—এবারে ম্যাট্রিক দেবে।

প্রবীর কহিল—স্কুলে পড়ে ? না, বাড়ীতে ?

—স্কুলে।

প্রবীর কহিল,—ভালো তো! আমার ধারণা ছিল, কলকাতার বাইরে বাঙলা দেশে মেয়েদের ম্যাট্রিক পড়ার রীতি নেই!

হেমপ্রভা কহিলেন—তা, ওদের ক্লাশে কটি মেয়েই বা পড়ে! পনেরো-ষোলটি মাত্র!

হাসিয়া প্রবীর কহিল—আর সকলে বোধ হয় বিয়ে হয়ে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে ঘর করছে!

হেমপ্রভা কহিল—মেয়েদের ডাগর করে' রাখতে সাহস হয় না বাবা। আমারো এক এক সময় মহা-ভাবনা হয়...ওঁকে বলি, আর পড়িয়ে কাজ নেই...মেয়ের বিয়ে দাও। নাহলে এর পরে পাত্রের বাপ-মা হয়তো কি বলবে! পাশ-করা মেয়ে নিয়ে শেষে বিপদে পড়বো!...কি জানো বাবা, মুখে লেখাপড়ার আদর মানুষ যতই করুক, মনে-মনে এখনো সেই পুরোনো ভাব জেগে আছে। ভাবে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বাচাল হবে...নিজেদের স্বাধীন মত নিয়ে, সুখ-দুঃখের মাপ কষে সারা জীবনকে হয়তো মাটী করে ফেলবে!

প্রবীর কহিল—কি জানি, এ সম্বন্ধে আমি কোনো কিছু ভাবতে পারি না। মানে, ভাববার কোনো সুযোগ মেলেনি। বাবার সঙ্গে চিরদিন বাস করেছি...পুরুষের সমাজ...পুরুষের সঙ্গ...তার মধ্যে মেয়েদের কোনো পরিচয় পাইনি তো। কাজেই এ সব কথা ভাববো কি করে' ?

পাষাণ

হেমপ্রভা কহিলেন—আমাদের এখানে ছিলেন তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী... খুব সাহেবী মেজাজের লোক...পয়সাওলা মানুষ...নেশা-ভাঙ করতো। অনেক বয়সে বিয়ে করে পশ্চিম থেকে সে আনলে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি ছিল পাশ-করা। কি যে হলো...বিয়ের বছর তিন পরে তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী সিঁড়ি থেকে পড়ে অপঘাতে মারা গেল! তাঁর স্ত্রী সেই অবধি বাড়ীর মধ্যে সেই যে বাসা বাঁধলো...জনপ্রাণীর সঙ্গে না করে দেখা; না রেখেছে কোনো সম্পর্ক! মানুষ কি করে এভাবে নিজেকে বন্দী করে' রাখে, বুঝতে পারি না! স্বামীর শোক প্রচণ্ড, মানি...তা বলে' এভাবে নিজেকে সবার আড়ালে বন্দী রাখা...চোখে এমন কখনো দেখিনি, কাণেও এমন কাহিনী শুনিনি বাবা।

প্রবীর বিস্ময় বোধ করিল, কহিল—তাঁর কে আছে আর?

—একটি ছোট মেয়ে...আর কেউ না।

—মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে হলে লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দরকার...

হেমপ্রভা কহিলেন—সে যা ব্যবস্থা, শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। অগাধ টাকা, মস্ত বাড়ী, বাগান...লোকজন আছে, জমিদারী আছে, সে-সব ঠিক চলছে। লোকজন দেখাশুনা করে...কিন্তু অন্দরের সঙ্গে তাদের কারো সম্পর্ক নেই...অন্দরে আছে দু'জন দাসী। কোনো-কিছুর দরকার হলে সেকালের নবাব-বাদশার মতো দাসী এসে বাইরের লোকজনকে বলে, তখন তার ব্যবস্থা হয়। তারাশঙ্করের এক দূর-সম্পর্কের সম্বন্ধী আছে। লোকটি মন্দ নয়...বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে লেখপড়া-জানা মেয়ে...বিয়ে করে সুখী হয়েছে বলে' শুনিনি। এখ

যে কেন এমন বন্দী হয়ে বাস করে...দেশশুদ্ধ লোকে ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে আছে।

প্রবীর কহিল—মাথা খারাপ নয় তো ?

—না।

—বয়স কত ?

—তা, তারাশঙ্কর মারা গেছে আজ তিন বৎসর...বৌয়ের বয়স বিয়ের সময় ছিল উনিশ-কুড়ি...এখন প্রায় চব্বিশ বছর হবে! আমাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল। মেয়েটির বয়স ছ'বছর...তারশঙ্কর মারা যাবার আগে বৌয়ের মুখে হাসি দেখিনি। মলিন মুখে থাকতো। দেখলে কষ্ট হতো।

প্রবীর কহিল—চক্রবর্তী নেশা করতো বললেন না ?...তার মেজাজ ছিল কেমন ?

—খুব বদমেজাজী ছিল। ভারী নিষ্ঠুর···শীকারে ছিল মস্ত নেশা। রাগ হলে কোনো-কিছুর বোধগম্যি থাকতো না···রাগের মাথায় না করতে পারতো, এমন কাজ ছিল না। এক মোসাহেব ছিল···তাকে মাথায় করে রাখতো। একদিন কি কারণে মোসাহেবের উপর গেল চটে—অমনি তাকে জুতো মারতে-মারতে পথে বার করে দিলে। বেচারী নেহাৎ ছাঁপোষা বলে' পুলিশে গেল না! সকলে তাকে বললে, কি করবে ? মোসাহেবটী গায়ের ধূলো ঝেড়ে বললে,—এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। যে-রকম রাগ করেছে... আমাকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ায়নি, কি মাটী খুঁড়ে পুঁতে ফেলেনি, এই আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি !...এই কথা বলে চলে গেল...

প্রবীর অবাক! বলিল—বলেন কি!

হেমপ্রভা বলিলেন—তাই। এর একতিল বাড়ানো নয়, বাবা। তা' যে কথা বলছিলুম। একদিন ওর বৌ দুঃখ করে আমায় বলেছিল। গরীবের মেয়ে...মা-বাপ পয়সা দেখে যে-লোকের হাতে সঁপে দিয়েছে... বৌটি বললে দিদি, বললে পাপ হবে! স্বামী! না হলে রাক্ষসের প্রাণেও বোধ হয় এর চেয়ে দয়া-মায়া আছে...

সুনীতি ফিরিল। তার হাতে রেকাবি...রেকাবিতে লুচি-তরকারী···

প্রবীর কহিল,—তাঁর স্ত্রী আর আপনাদের সঙ্গে দেখা করেন না?

—না...তারাশঙ্কর মারা যাওয়া ইস্তক এই ব্যবস্থা। আমি তবু যেতে চেয়েছিলুম, তা দাসী বলে গেল,—না, আপনি যাবেন না...মা দেখা করবেন না···যেতে মানা করে দেছেন...

সুনীতি কহিল—ও, তারাশঙ্করবাবুর বৌয়ের কথা বলচো?

—হ্যাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দিনী

সুনীতি কহিল,—এত চমৎকার দেখতে! কাকেও অমন দেখিনি! ওঁকে দেখলে মনে হয়, এমন মুখ ভগবান ঐ একখানি গড়েছেন!

হেমপ্রভা বলিলেন—আমারো তাই মনে হয়েছিল, যখন ওকে প্রথম দেখি! যেমন দেখতে, তেমনি কথাবার্ত্তা...ভারী মিষ্টি!

সুনীতি বলিল—কিন্তু দেখেচো মা, মুখে-চোখে দুঃখ যেন মাখানো রয়েছে...

হেমপ্রভা কহিলেন,—অত ঐশ্বর্য্য থাকলে কি হবে? বড় দুঃখী! দেখিনি, জানিনা—তবে লোকজনের মুখে শুনতুম, অনেক রাত্রে তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী হুঙ্কার তুলছে...আর কি-মার মারতো ঐ বৌকে! চাকর-বাকরে বলতো, রাগে তাদের গা করকর করতো...কিন্তু তারা তো বাধা দিতে পারে না। একজন দাসী ছিল—বিন্দুর-মা। সে তো ও-বাড়ীতে চাকরি করতে পারলে না! আমার কাছে এসে বললে, অমন রাক্ষুসে কাণ্ড চোখে দেখা যায় না, মা!...বৌকে আমরা বুঝোতুম...যেটুকু পারতুম, সান্ত্বনা দিতুম...তারাশঙ্কর শেষে বৌকে আর আমাদের এখানে

আসতে দিতো না। তবু দু'একদিন গেছি সেখানে...বৌয়ের মুখ ভয়ে পাঙাশ হয়ে থাকতো! চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে ফুলে থাকতো...তারপর মেয়ে রাণু...আঙুরের থোলোর মতো কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল...মুখখানিতে মায়ের মুখ বসানো...ফোটা-গোলাপের মতো রঙ...

প্রবীর কহিল—তারপর?

হেমপ্রভা কহিলেন—মায়ের সঙ্গে আর দেখা হতো না। দাসী-চাকরে বলতো, মুখে কথা নেই...কেমন যেন হয়ে গেছেন! কেউ বলতো, মাথা খারাপ! কেউ বলতো, অসুখ! মানে, ও-বাড়ীতে একটা কিছু যে হচ্ছে, তারি আভাস পেতুম! রাণুর বয়স তখন তিন-বছর, সেই সময় ঘটলো সর্ব্বনাশ! তারাশঙ্কর মারা গেল সিঁড়ি থেকে পড়ে।

প্রবীর কহিল—সিঁড়ি থেকে পড়ে! কি করে পড়লেন?

হেমপ্রভা বলিলেন,—কেউ বললে, পুড়ে মারা গেছে। বৌটি শুতো মেয়ে নিয়ে অন্য ঘরে—সে জানতে পারেনি! পোড়া-গন্ধ পেয়ে চাকর-বাকর এসে পড়ে...আগুন নিবোয়...কিন্তু তারাশঙ্কর তখন এমন পুড়ে গেছে যে দেখলে চেনা যায় না...

সকলেই সে-কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রবীর কহিল—আগুনে পড়ে যান্‌নি?

হেমপ্রভা কহিলেন—সঠিক জানা গেল না। লোকে বললে, বড় টেবিল্‌-ল্যাম্প থাকতো খাটের পাশে উঁচু টেবিলে...কি করে' আলো উল্টে মশারিতে আগুন লেগেছে...! কেউ বললে, তা নয়, মদ খেয়ে নেশা করে ঘরে আসতো...হয়তো নেশার ঝোঁকে টেবিলে ধাক্কা লেগেছে—তাতেই আলো উল্টে মশারিতে আগুন লাগে...নেশায় বেহুঁস থাকার

দরুণ জানতে পারেনি।...মানে, কিছু নির্ণয় হলো না তো। পুলিশ এলো, তদন্ত হলো, সবই হলো...কি করে কি কাণ্ড যে ঘটলো, তার আর হদিশ মিললো না!

সুনীতি কহিল—চুপ করো মা। পরের কথা নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ? উনি মনে করবেন, তুমি পরচর্চ্চা ভালোবাসো!...

কথার শেষে সুনীতি মৃদু হাসিল।

হেমপ্রভা বলিলেন,—রহস্য হয়ে আছে আজ পর্য্যন্ত। কিন্তু তারপর থেকে আমরা ভেবেছিলুম, বৌয়ের সঙ্গে দেখাশুনা হবে!...হলো না। এ ব্যাপারের পর থেকে বৌয়ের কি যে হলো...সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিয়ে ও-বাড়ীতে নিজেকে এমন বন্দী রেখেছে যে কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার উপায় নেই! বাড়ীতে কেউ যাবে, তাতেও মানা।... যদি বাগানে আসে, যদি কারো ছাদ থেকে কেউ দেখতে পায়, বৌ অমনি সরে চলে যায়। কি যে ব্যাপার,...আমার সঙ্গে অমন ভাব ছিল... কতদিন লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, দেখা করতে যাবো। তাতে বৌ জবাব দিয়েছে, না, দয়া করে আসবেন না!

প্রবীর কহিল—দুঃখে-শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নিশ্চয়।

হেমপ্রভা কহিলেন—আরো অন্য মেয়ে বিধবা হয়েছে, দেখেছি তো।...স্বামীর সঙ্গে খুব ভালোবাসা...তারাও এমন হয় না। এ তো স্বামীর হাতে অত্যাচারই সয়েছে শুধু!...যাক, কে জানে কি ব্যাপার!

প্রবীর কি ভাবিতেছিল...হেমপ্রভা কহিলেন,—খেয়ে নাও বাবা। কি ভাবচো?

নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবীর বলিল—এ রহস্য জানবার জন্য মনে খু-
কৌতূহল হচ্ছে।

হেমপ্রভা কহিলেন—মিছে কৌতূহল...

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া প্রবীর ভাবিতে বসিল...

মনের উপরে ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া দাঁড়ায় সুনীতি !...কিশোরী এমন সুন্দর হয় ! তার হাসি-কথায় এমন সাবলীল মাধুর্য্য ! বাবা বলিতেন,—তোমার বিয়ে দিয়ে বৌ আনবো।...চমৎকার বৌ!...সে মেয়ে আমার জানা।

বাবা কি এই সুনীতিকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিতেন ?

যদি তাই হয়...

কিশোর মন কল্পনার তুলি দিয়া মনের মতো ছবি আঁকিতে বসিল... ফুলে ফুলে পৃথিবী যেন ফুলময় হইয়া উঠিয়াছে ! সে ফুলের রাজ্যে ফুলের রাণীর মতো হাসি-মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুনীতি ! তার হাসিতে মাধুরী···কথায় মাধুরী···গানে আরো অনেক মাধুরী।

কিন্তু...

ঐ তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বৌ ! এ নিবিড় রহস্যের অন্তরালে কি করিয়া বাস করিতেছে ? কল্পনায় দেখিল, চোখের সামনে ভারী মোটা পর্দ্দা...সে পর্দ্দার আড়ালে রহস্যমী কি বেশে যে নিজেকে গোপন রাখিয়াছে !

কেন ? কেন ?

এ্যাডভেঞ্চার ! তরুণ মনে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা প্রবল...

এ কথা ভাবিতে ভাবিতে আগ্রহ এত বাড়িয়া উঠিল যে প্রবীরের মনে হইল, দু হাতে সবলে যদি এ পর্দ্দা টানিয়া ছিঁড়িয়া ও ওদিককার রহস্য সে আবিষ্কার করিতে পারিত!

কিন্তু কি করিয়া... কি করিয়া তাহা হয়?

হেমপ্রভার সঙ্গে কথায় কথায় আরো জানিল, তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি সামান্য নয়। জমিদারী আছে, তার আয় বছরে প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা; তার উপরে নগদ টাকা-কড়ি আছে প্রচুর...সে সব স্ত্রীর নামে বিবাহের পরেই দানপত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছে...তারাশঙ্করের মৃত্যুর পর স্বামীর নামে বৌ গঙ্গায় ঘাট তৈয়ার করাইয়া দিয়াছে... মেয়েদের স্নানের ঘাট!

তারপর শোকের সাগরে নিজেকে এমন নিমগ্ন রাখিয়াছে যে বাহিরের পৃথিবী তার কোনো সংবাদ রাখে না...রাখিবে, কোনোদিকে তার এতটুকু রন্ধ্র অবধি নাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হারানো মেয়ে

তিন-চার মাস পরের কথা। সেদিন কি একটা মাসের সংক্রান্তি... বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা...অন্দরে হেমপ্রভা পূজার আয়োজন করিতেছিলেন।

কৈলাস চাটুয্যে বৈকালের দিকে সে-ঘরে বসিয়াছিলেন। কৈলাসের সঙ্গে হেমপ্রভার কথা হইতেছিল...

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন,—ইন্দু যদি বেঁচে থাকতো, এ কথা বলতে আমার কোনো বাধা থাকতো না...

হেমপ্রভা বলিলেন—প্রবীর বড় ভালো ছেলে...নীতিকে তার ভালো লাগে। দেখেছি তো, এ বাড়ীতে এলে নীতির একখানি গান না শুনে কখনো বাড়ী ফেরে না...তাছাড়া দু জনে নানা কথা নিয়ে তর্ক করে... ঝগড়া করে...আবার ভাব করে। তাও বলি, মাথার ওপরে কেউ তো নেই...নিজে থেকে কি করে বিয়ের কথা তোলে?

কৈলাস বলিলেন—তুমি আভাসে-ইঙ্গিতে কথাটা পাড়ো...বোঝো আগে ওর কি মত।

হেমপ্রভা কহিলেন—কথায়-কথায় কাল বলেছিলুম, মীতির বিয়ের জন্য ভেবে আমরা অস্থির। আছে তোমার জানা কোনো ভালো পাত্র?

—তাতে কি জবাব দিলে?

—বললে, এর মধ্যে বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, মাসিমা? এখন লেখাপড়া শিখুক। এমন ভালো মেয়ে...যেমন রূপ, তেমনি গুণ...ওর বিয়ের জন্য আপনাকে কোনদিন ভাবতে হবে না।

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন,—শুধু এই কথা বললে?

—হ্যাঁ। এ থেকে তো কিছু বোঝা যায় না! কিন্তু প্রবীরকে জামাই পেলে আমার আর কোনো সাধ অপূর্ণ থাকে না! জামাইয়ের মতো জামাই! যেমন রূপ-গুণ...তেমনি পয়সা-কড়ি আছে...মেয়ে চিরদিন সুখে থাকবে!

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—তোমার মেয়ে বড় হয়েছে...তার মতামত...

হেমপ্রভা কহিলেন—আমাদের মতে আমার মেয়ের অমত হবে, এমন শিক্ষা সে পায়নি কোনো দিন...

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

হেমপ্রভা কহিলেন—ওকে ডেকে তুমি একদিন স্পষ্ট করে এ কথা বলো...

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন,—আমার চেয়ে তোমার বলা মানাবে। আমার সঙ্গে এতখানি মেশে না। তোমার কাছে সে নিত্য আসে... তুমি বলো।

হেমপ্রভা বলিলেন—মুখে এলেও কথাটা কাল বলতে পারলুম না!

পাছে ভাবে, এই জন্যই মাসিমার এত আদর-যত্ন...স্বার্থ মনে ষোল-আনা! হাজার হোক, আমাদের সঙ্গে কদিন বা মিশছে! ছোট বেলা থেকে মেলামেশা থাকতো, তাহলে এ কথা বলতে বাধা ছিল না! ডাগর ছেলে... পাছে ভুল বোঝে...যদি বলে, না? ভয় হয়...নীতির পক্ষে তাহলে ভারী অপমানের কথা হবে।

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—তাহলে থাক্, বলো না,...

হেমপ্রভা রাগ করিলেন, কহিলেন,—ঐ জন্মে তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা কইতে আসি না। দেশের কাজে এত মাথা খেলে, আর ঘরের কাজের বেলায় ভোলানাথ হয়ে আছো!...

রাগ করিয়া তিনি এক-মনে নৈবেদ্য সাজাইতে লাগিলেন। ও কথার পর কি কথা বলিবেন, কৈলাস চাটুয্যে ভাবিয়া পাইলেন না! তিনি বলিলেন,—কাশিম এসে বসে আছে। ও-পাড়ায় পুকুর কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তার সঙ্গে কথা কয়ে আসি···বেচারী অনেকক্ষণ বসে আছে।

এ বাড়ীতে যখন এমনি কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, তখন এ-বাড়ীর অনেক দূরে যাহা ঘটিতেছিল, বলি...

তোলা ফটকের কাছে মস্ত মেলা বসিয়াছে। সে মেলায় বড় বড় পুতুলের একজিবিশন্। দাসী আসিয়া তারাশঙ্করের অন্দরে তার যে বিরাট রিপোর্ট বর্ণনা করিতেছিল, সে রিপোর্ট শুনিয়া রাণু অসম্ভব বায়না ধরিল—আমি দেখবো···আমি দেখবো···

সে বায়না থামানো গেল না। রাণুর মা নীলিমা বলিল—ও-সব দেখতে নেই রাণু···ভালো নয়।

রাণু বলিল—না, দেখতে নেই? সব্বাই কত কি দেখে...দেখে এসে বলে···তুমি আমাকে কিছু দেখতে দাও না...এ পুতুল দেখতে না দিলে দেখো, কি হয়!

নীলিমা বলিল,—কি হবে?

রাণু বলিল—আমি মরে যাবো।

মেয়ের কথায় মা শিহরিয়া উঠিল! মরণ! ওরে, মরণকে কি ভয় করে নীলিমা, তা যদি জানিতিস্···

রাণু কোনো কথায় ভুলিল না। তার এক আবদার,—একটি বার আমি দেখবো···দেখবোই আমি পুতুল···মানুষের মতো বড় পুতুল···

দাসী বলিল—নিয়ে যাই না মা...বেহারী সঙ্গে যাবে'খন। যাবো আর আসবো...

রাণুর অধীর আবেগ-ভরা দু'চোখের দৃষ্টি মায়ের বুকে ফুটিল কাঁটার মতো! নীলিমা বলিল,—বেশ, তবে নিয়ে যাও। কিন্তু দেরী করো না··· বড্ড ভাবনা হবে আমার।

সানন্দে দাসী কহিল,—না মা, দেরী হবে না। যাবো আর আসবো।

রাণু গেল। সঙ্গে গেল দাসী পার্ব্বতী আর ভৃত্য বেহারী।

লোকে লোকারণ্য! পুতুল···পুতুলের পর নাগরদোলা···ওদিকে মুখোশ-আঁটা তিন-চারজন লোক একটা উঁচু প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বাজনা বাজাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিতেছে—নয়া তামাসা...নয়া তামাসা...

পাষাণ

রাণু দেখিল চোখের সামনে নূতন পৃথিবী! আনন্দ আর বিস্ময় তার ছোট মনটিকে মাতাইয়া নাচাইয়া একশা করিয়া দিল!

পার্ব্বতী আর বেহারী মুখোশ-আঁটা মানুষগুলার কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব। এবং সেই ফাঁকে রাণু ভিড়ের মধ্য দিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লোকারণ্যে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

চমক ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী ও বেহারী দেখে, রাণু নাই!...

কোথায় গেল রাণু?...রাণু...রাণু...রাণু...

জন-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ...সে তরঙ্গে রাণুর দেখা মিলিল না।...

সে জন-তরঙ্গের আঘাতে বিস্মিত সন্ত্রস্ত রাণু একেবারে সেই তোলা ফটকের ওদিকে গিয়া পড়িয়াছে! লোকের ভিড়ে হাঁফ ধরিয়া তার নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

এদিকে ভিড় কম...রাণু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়...বেহারী? পার্ব্বতী?

আশেপাশে যে-লোকের পানে চায়, অপরিচিত মুখ! ভয়ে রাণু কাঁদিয়া ফেলিল।

মেলার নেশায় মত্ত জনগণ সে কান্নায় টলিল না।

ওপাশে ঘন বন...নিরুপায় রাণু কাঁদিয়া সারা...

চুঁচড়োর দিক হইতে ফিরিতেছিল প্রবীর...

চুঁচড়োয় গিয়াছিল অকারণে...মনের খেয়ালে। ফিরিতেছিল এই পথে...মোটরে চড়িয়া। হয়তো ভবিতব্য! নহিলে এমন ঘটিবার কারণ খুঁজিয়া পাই না!

টুকটুকে ছোট মেয়েটিকে কাঁদিতে দেখিয়া প্রবীর গাড়ী থামাইল...

গাড়ী হইতে নামিয়া রাণুর কাছে আসিল; কহিল,—তুমি কাঁদচো কেন?

কাঁদিয়া রাণু কহিল,—আমি হারিয়ে গেছি...

—কাদের বাড়ীর মেয়ে তুমি?

—আমি...আমি...আমাদের বাড়ীর মেয়ে...

—তোমার নাম কি?

—আমার নাম রাণু।

—বাবার নাম?

—জানি না।...

রাণু কাঁদিতে লাগিল। তার চারিদিকে ভিড় জমিল...অলস লোকের দল তামাসা দেখিতে নিত্য যেমন জমে, তেমনি।

রাণুকে সঙ্গে লইয়া ভিড় ঠেলিয়া প্রবীর অগ্রসর হইল...কহিল,—এখানে কোথায় এসেছিলে কার সঙ্গে?

রাণু বলিল,—পুতুল দেখতে এসেছিলুম পার্ব্বতী আর বেহারীর সঙ্গে...

প্রবীর চলিল পুতুলের আসরের দিকে পার্ব্বতী আর বেহারীর সন্ধানে...

দেখা মিলিল। পাগলের মতো ভিড় ঠেলিয়া তারা ছুটাছুটি করিতেছে...

রাণুকে দেখিয়া পার্ব্বতী যেন প্রাণ পাইল! ছুটিয়া আসিয়া রাণুর হাত ধরিয়া কহিল,—এই যে রাণু দিদিমণি...আঃ!

প্রবীর তাদের ভর্ৎসনা করিল: বলিল,—এমন সখ, মেয়ের খোঁজ

রাখো না! চলো, আমি তোমাদের বাড়ী যাবো মেয়ে নিয়ে...তোমাদের গাফিলির কথা বলে দেবো!

পার্ব্বতী ও বেহারীর মুখ শুকাইল। তারা বলিল—কিন্তু...

প্রবীর কহিল—কিন্তু নয়...নিশ্চয় যাবো! যদি আমার সঙ্গে দেখা না হতো?

তাহা হইলে কি হইত, ভাবিয়া পার্ব্বতী দু'চোখে অন্ধকার দেখিল। তাহা হইলে সে কি আর বাড়ী ফিরিত?

ভিড় ছাড়িয়া আসিয়া প্রবীর কহিল—কোন্ বাড়ীর মেয়ে?

পার্ব্বতী কহিল—তারাশঙ্করবাবুর মেয়ে।

—তারাশঙ্করবাবু!...যিনি মারা গেছেন?

পার্ব্বতী বলিল—হ্যাঁ।

প্রবীরের মন মাতিয়া উঠিল...এমন সুযোগ মিলিয়াছে! বাঃ!

প্রবীর কহিল—চলো, আমিও সঙ্গে যাবো...

পার্ব্বতী চাহিল বেহারীর পানে...বেহারী যেন আর বেহারী নাই!

প্রবীর কিন্তু ছাড়িল না। পথে রাণুর সঙ্গে অনেক কথা হইল। রাণু বলিল, তার অনেক পুতুল আছে,—পুতুলরা গাড়ী চড়িয়া বেড়ায়; রাণু তাদের বিবাহ দেয়...তাদের খাওয়ায়-পরায়...রাণু কত কাজ করে...

ক'জনে আসিল বাড়ীর সামনে। মস্ত বাড়ী। পাশে বাগান। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় যেন নিঝুম পুরী...যেন সেই রূপ-কথার বন্দিশালা...

প্রবীর ভাবিল, এ বন্দিশালায় বাস করে রূপ-কথার সেই বন্দিনী রাজকন্যা...রূপের প্রতিমা আজ বিষাদের মলিন ছায়া!

পার্ব্বতী বলিল—আমরা তাহলে আসি...

প্রবীর বলিল—যাঁর মেয়ে, তাঁর হাতে আমি মেয়ে পৌঁছে দেবো।

পার্ব্বতী অবাক!

বেহারী কহিল—কিন্তু মা কারো বাড়ীতে আসা পছন্দ করেন না।

প্রবীর বলিল—তোমরা বলো গে, মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল...যিনি মেয়ে খুঁজে পেয়েছেন, যাঁর মেয়ে তাঁর কাছে তিনি মেয়ে পৌঁছে দিতে চান। ভয় নেই, আমার সামনে তাঁকে বেরুতে হবে না। তিনি আড়ালে থাকবেন। আমি শুধু তাঁর মুখে শুনে যাবো, তিনি মেয়ে পেয়েছেন।

কথাটা নিজের কানে ঠেকিল আশ্চর্য্য রকম...এ কি তার আবদার!

পার্ব্বতী এবং বেহারীও কম আশ্চর্য্য হইল না! বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো তারা প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক...খাশা ভদ্রলোক...সন্দেহ নাই! এবং বেশ বড়মানুষ... বেশভূষায় চেহারায় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না! কিন্তু...

প্রবীর ডাকিল—রাণু...

রাণু বলিল—কি?

প্রবীর বলিল—আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি...তুমি গিয়ে তোমার মাকে বলো...তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে, যে তোমাকে খুঁজে দেছে, সে লোক তাঁকে শুধু একটি কথা বলে যাবে। পারবে বলতে?

কৃতজ্ঞতায় রাণুর মন ভরিয়া ছিল। রাণু বলিল—পারবো। আপনি আমার সঙ্গে বাড়ীতে আসুন। বাইরের ঘরে বসবেন...আমি ছুটে গিয়ে মাকে খপর দেবো...

তাহাই হইল...

বাহিরের ঘরে প্রবীর বসিয়া আছে, রাণু ফিরিল, ফিরিয়া কহিল,—মা এসেছে...বাইরে দাঁড়িয়ে আছে...

বন্দিনী রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য মন আকুল অধীর...কে এ রহস্যময়ী! কি সে রহস্য···?

প্রবীর আসিল ঘরের দ্বারে...

বাহিরে মস্ত দর-দালান। আলো জ্বলিতেছে। সে আলোয় প্রবীর দেখিল, দ্বারের ঠিক বাহিরে রূপের প্রতিমা···নত-মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রবীর কহিল—মাপ করবেন...রাণু হারিয়ে গিয়েছিল...ভাগ্যে আমি দেখেছিলুম...এবার থেকে তাকে যখন বাইরে পাঠাবেন, আপনার লোক-জনকে খুব হুঁসিয়ার করে দেবেন···

রাণু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মায়ের কাছে। তার বড় সাধ, ভদ্রলোকটির সঙ্গে মা কথা কয়...

প্রবীর কহিল—আপনাকে কষ্ট দিলুম বলে' ক্ষমা চাইছি...

নীলিমা মুখ তুলিল। তুলিয়া এদিকে চাহিল। চাহিবামাত্র প্রবীরের চোখে চোখ মিলিল। নীলিমা আবার মুখ নামাইল...

প্রবীর বলিল—আপনি ক্ষমা করেছেন কি না, জানতে পাবো না?

নীলিমা কথা কহিল...মৃদু কণ্ঠে বলিল—কি যে বলবো জানি না। আমি কারো সঙ্গে কথা কই না। কথা কইতে এক-রকম ভুলে গেছি...

প্রবীর কহিল—শুধু একটি কথা জানতে চাইছি...আপনি রাগ করেননি আমার এ স্পর্দ্ধায়?

নীলিমা কহিল—রাগ কেন হবে? না তো! আমি...আমি... আপনার এ উপকার আমি কখনো ভুলবো না।

প্রবীর খুশী হইল ; বলিল—আসি। নমস্কার।

—নমস্কার।

সদরে আসিয়া প্রবীর আবার ফিরিল...নীলিমা তখনো সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে...যেন কাঠের পুতুল!

প্রবীর কহিল—আর একদিন আমি আসবো, রাণু, তোমার পুতুলদের ঘরকর্ণা দেখাবে তো?

রাণু চাহিল মায়ের পানে...মা চুপি-চুপি তাকে কি বলিলেন। একমুখ হাসিয়া খুশীভরে রাণু বলিল,—আসবেন। আমার পুতুল দেখাবো। এত পুতুল...

হাসিয়া প্রবীর কহিল—বেশ, তাহলে আমার নেমন্তন্ন রইলো তোমার খেলা-ঘরে।

খুশী-মনে রাণু বলিল,—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারপর

'বাড়ী ফিরিয়া মন ভরিয়া রহিল.. মোহ !

প্রতিমা...কিন্তু পাষাণ হইয়া গেছে ! মুখে-চোখে এমন করুণ-কাতর অসহায় ভাব...আর কখনো এমন মুখ দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না !

ছোট্ট মেয়ে রঞ্জু...অশ্রুর বাষ্পে তারো মন যেন কুয়াশায় কেমন মলিন হইয়া আছে !

সকলে বলে, রহস্য !...

যেদিন সিঁথিতে সিঁদূর দিয়া ঐ কিশোরী এ গৃহে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল, তার মুখে ছিল হাসি-কথা, বুকে ছিল আশার কুসুম ! মানুষ এ-বয়সে যেমন আশা করে, যেমন স্বপ্ন দেখে, তেমনি আশায়, তেমনি স্বপ্নে উঁহারো মন ভরিয়া থাকিত !

হেমপ্রভা বলিলেন, দাসী-চাকরে বলিত, স্বামী নিষ্ঠুর...প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া দিত ! মুখের হাসি দুদিনে মিলাইয়া গেল...তারপর মুখে-চোখে নিরুপায়-নৈরাশ্যের কালো ছায়া...সে কথা খুব সত্য ! সে ছায়া প্রবীর দেখিয়াছে ! সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে মুখের যতটুকু দেখা

গেছে, শুধু ছায়া...মলিন ছায়া। কথা কহিল...যেন সুদূর অতীত-লোক হইতে। বলিল, কথা না কহিয়া কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছে। মেয়ে হারাইয়া গিয়াছিল, সে মেয়েকে যে আনিয়া দিয়াছে, তাহাকে কি কথা বলিতে হয়, জানে না! বলিল, এ উপকার জীবনে ভুলিবে না!...

এই ছোট্ট কথা, ছোট্ট পরিচয়টুকুতে প্রবীর যা বুঝিয়াছে,...তার বুক ব্যথায় ভরিয়া গেছে।

দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া প্রবীর ভাবিতেছিল রাণুর কথা...নীলিমার কথা। অমন নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায়, সুখহীন আবহাওয়ায় পড়িয়া থাকিলে মন চিরদিন অন্ধকারে ভরিয়া থাকিবে। আলো-বাতাসের স্পর্শহারা ও-মন শতদলের মতো সহজ স্বাভাবিক শ্রীতে বিকাশ পাইবে কি করিয়া?...

আকাশে রাশি-রাশি নক্ষত্র...দূরে এক টুকরা চাঁদ...চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না...সে-আলোয় পৃথিবীর বুক আলো হয় নাই...পৃথিবীর বুক ব্যাপিয়া যেন একটা নিরানন্দ ভাব বিরাজ করিতেছে!

প্রবীর ভাবিল, রাণুর ভবিষ্যৎ কেমন হইবে? মাকে ছাড়া পৃথিবীর আর কাহাকেও জানে না! পৃথিবীর আর-কিছুর সঙ্গে তার পরিচয় নাই!...

এর পর...?

রাণু যখন বড় হইবে? রাণুর যখন বিবাহ হইবে? এ বিজন নিঃসঙ্গতায় বাড়িয়া উঠিলে পৃথিবীতে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া

চলিতে পদে পদে কি কুণ্ঠা, কি সঙ্কোচেই না বেচারী সারা হইবে! তার সারা জীবন যেন আবরণে-ঢাকা মন্থর থাকিবে!...

কি করিয়া...ঐ দুর্ভেদ্য কারার বুকে পৃথিবীর আলো-বাতাসের ধারা বহিয়া আনা যায়?...

কিন্তু অকস্মাৎ তার এ মাথাব্যথা কেন? দুদিনমাত্র এখানে আসিয়াছে—কাজের অভাব নাই...সব কাজ ঠেলিয়া এদিকে মন এমন অসম্ভব ঝোঁক দিয়া বসিল কি কারণে?

কিন্তু কেন ঝোঁক দিবে না? ধরণীর জীব...আলো-বাতাসে সকলের সমান অধিকার আছে! দুঃখ আছে, শোক আছে, সত্য; কিন্তু সে দুঃখ-শোকে বুকখানাকে পাষাণ করিয়া রাখিয়া বাঁচায় লাভ নাই! যদি বাঁচিতে হয়, বাঁচার মতো বাঁচো! নহিলে এ যে বাঁচিয়া মরিয়া থাকা...

তরুণ মনের জীবনোচ্ছ্বাস দিয়া প্রবীর বিচার করিতে লাগিল একান্তে ঐ পাষাণ-পুরীর লোকজনের ব্যাপার...

নীলিমা...

মনে হয়, ও জীবন-পুষ্পটি ফুটিতে গিয়া ফুটিতে পারিল না! ফুটিলে পুষ্পের গন্ধে-বর্ণে মাটীর পৃথিবী সুন্দর হইত!...

উমা দেবী আসিয়া এ চিন্তার সূত্র কাটিয়া দিলেন; ডাকিলেন,—দাদু...

চমকিয়া প্রবীর চাহিল উমার পানে। দেখিল, উমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুনীতি। বারান্দায় বড় ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সে আলোয় প্রবীর দেখিল, সুনীতি যেন জীবনের হিল্লোল বহিয়া আনিয়াছে! সে হিল্লোলে হাজার হাজার আশার ফুল...তার বর্ণে-গন্ধে অপরূপ কান্তি!

উমা দেবী কহিলেন,—স্থনীতি এসেছে তোমায় ডাকতে।... অনেকক্ষণ এসেছে। আজ ওদের বাড়ী সত্যনারাণ হচ্ছে। বৌমা তোমাকে যেতে বলেছেন।

প্রবীরের মনে পড়িল, ঠিক!

প্রবীর কহিল—ও, আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

উমা দেবী কহিলেন—যাবে তো?

প্রবীর কহিল—যাবো। চলো স্থনীতি।

স্থনীতি বলিল—আমি তাই ভেবেছিলুম বড়-ঠাকুমা। তোমায় বললুম তো, প্রবীরদা ভুলে গেছেন।

প্রবীর বলিল—ভুলে গিয়েছিলুম স্থনীতি। মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে আছে! কেবলি মনে হচ্ছিল, কি যেন করবার কথা ছিল—করা হলো না! সে করার মানে যে তোমাদের বাড়ী গিয়ে সত্যনারাণের সিন্নী খাওয়া, কিছুতেই তা মনে আসছিল না।

কথাটা বলিয়া প্রবীর হাসিল।...

শুধু সিন্নী খাওয়াইয়া হেমপ্রভা ছাড়িয়া দিলেন না; বলিলেন—আজ রাত্রে এইখানেই তোমাকে খেতে হবে, বাবা...

প্রবীর কহিল—তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, মাসিমা!... জানেন তো, মা-মাসির আদর কেমন, কখনো তা জানিনি। সে স্নেহ, সে আদর পেলে ছেড়ে দেবো, এমন কথা কখনো ভাববেন না।

মমতায় হেমপ্রভার মন গলিয়া গেল। মনের সামনে সেই কবেকার হারানো কমলা দেবীর মুখ যেন ভাসিয়া উঠিল। সে মুখ সর্ব্বক্ষণ হাসিতে ভরিয়া থাকিত! তাহারি ছেলে প্রবীর...

হেমপ্রভা বলিলেন—তোমাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছি, বাবা! ভাবি, এ্যাদ্দিন না দেখে কি করে বেঁচে ছিলুম!

হাসিয়া প্রবীর কহিল—কখনো তো খোঁজখপর ন্যাননি! এখান থেকে কলকাতা কতই বা দূর বলুন? তেমন টান থাকলে গিয়ে দেখে আসতে পারতেন।

সলজ্জ ভাবে হেমপ্রভা বলিলেন—সে কথা বলতে পারো বাবা।... অপদার্থ মেয়েমানুষ বলে' চুপ করে ঘরে পড়ে আছি...

প্রবীর কহিল—কিন্তু মাসিমা, আমার এক এক সময় অভিমান হয়—যখন ভাবি, এতকাল মাসিমা কেন আমার খোঁজখপর ন্যাননি!

হেমপ্রভা কহিলেন—এ ত্রুটি মাসিমার আর কখনো যাতে না হয়, সে-ভার তোমারি হাতে বাবা।

প্রবীর এ কথার অর্থ বুঝিল না, কহিল,—তার মানে?

হেমপ্রভা লজ্জা বোধ করিলেন। ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে মনের সে বাসনা না প্রকাশ হইয়া পড়ে! প্রবীর ভাবিবে, স্বার্থের জন্যই বুঝি এত স্নেহ, এমন আদর!...

তিনি বলিলেন—মানে খুবই সহজ বাবা। উপযুক্ত ছেলে...এখন তোমাদেরই কাজ আমাদের দেখবে-শুনবে খোঁজখপর নেবে...

মনের ভার এ কথায় হালকা হইয়া গেল!...

হেমপ্রভা কহিলেন—তোমরা বসো গে...বেশী দেরী হবে না। পূজোর পাট চুকে গেছে। ঠাকুরের ওদিকে কালিয়া নামলো কি না দেখে আসি...

প্রবীর কহিল—পূজোর কাজ আপনি নিজের হাতেই করেন, মাসিমা?

—হ্যাঁ বাবা···এ কাজের ভার কারো উপর ছেড়ে দিতে পারলুম না আজ পর্য্যন্ত...

প্রবীর কহিল—খুব ভালো, মাসিমা !···এ সব পূজোর কাজের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই...তবে মনে হয়, এগুলো আছে বলে আজো আমরা বাঙালী আছি···ফিরিঙ্গি বনিনি ! তা, সুনীতিকে এ সব করতে স্থান না কেন ? এ সব পাশ-করা মেয়ে যদি এর পরে ঠাকুর-দেবতা না মানে, তাহলে তো বাঙালীর ঘর থেকে একটা মস্ত জিনিষ,···মানে, আরাম, সুখ, সান্ত্বনা লোপ পাবে !

এই অবধি বলিয়া প্রবীর চাহিল সুনীতির পানে; কহিল—কি বলো সুনীতি, পারো মাসিমার মতো পূজার কাজ করতে ? শক্ত কাজ··· শেলি-সেক্সপীয়রের মানে বোঝার চেয়ে শক্ত !

হেমপ্রভা কহিলেন,—দরকার হলে করবে বৈ কি...বাঙালীর ঘরে জন্মেছে। যত লেখাপড়াই শিখুক, ঠাকুর-দেবতা মানবে না, এমন মেয়ে বাঙলায় হতে পারে না !

প্রবীর কহিল—আপনি জানেন না মাসিমা···এমন মেয়ে আমি হাজার হাজার দেখেছি ! তারা ভাবে, পূজা করাটা বর্ব্বরতা ! সে সব মেয়ে গান গায়, কাব্য-নাটক পড়ে, আর প্রজাপতি সেজে আসর সাজিয়ে বেড়ায়। কলকাতায় এমন দু'একটা আসরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে বৈ কি। সত্যি মাসিমা, আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও এ সব পূজার্চ্চনায় আমার খুব মমতা আছে···মনে হয়, এগুলো গেলে দুঃখী বাঙালী বাঁচবার অবলম্বন হারাবে !

হেমপ্রভা বলিলেন—তোমার মুখে এ কথা শুনে আমি এতটুকু

আশ্চর্য্য হইনি! তোমার মা ঐ এতটুকু বয়সে এ সব পুজোপাট নিজের হাতে করতেন। এ কাজে কি নিষ্ঠাই না তাঁর ছিল। সেই মায়েরই ছেলে তো তুমি!

সুনীতির সহিত প্রবীর আসিল পাশের ঘরে।

প্রবীর কহিল—সেই এক প্রোগ্রাম—সঙ্গীত?

সুনীতি কহিল—আপনি গান শুনতে ভালোবাসেন যে!

প্রবীর কহিল—গান রেখে শুধু গল্প করতে পারো সুনীতি?

সুনীতি বলিল—কি গল্প করবো, বলুন।

প্রবীর কহিল—তার-আগে আর একটু কাজ সেরে নিলে হয় না?

—কি কাজ?

প্রবীর কহিল—আমার সঙ্গে এই যে লৌকিকতা করো, এটুকু পরিত্যাগ।

কুতূহলী দৃষ্টিতে সুনীতি প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া প্রবীর কহিল—আমাকে 'আপনি' বলা ছেড়ে 'তুমি' বলবার চেষ্টা করো। তাতে দুজনে আরো কাছাকাছি হবো। 'আপনি' বললে আমার মনে হয়, আমি যেন কোন্ কত-দূরের নিঃসম্পর্ক অতিথি!

লজ্জায় মুখ নামাইয়া সহাস-ভাষ্যে সুনীতি বলিল- একবার চেষ্টা করবো।

প্রবীর কহিল—এবং আজ থেকে…কেমন?

মাথা নাড়িয়া সুনীতি জানাইল, আচ্ছা!

প্রবীর খুশী হইল। কহিল—ভালো কথা, আজ এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেছে সুনীতি, শুনলে চমকে উঠবে।

—কি ?

প্রবীর কহিল—ঐ যে পাষাণ-পুরী আছে—তারাশঙ্কর বাবুর বাড়ী।... সে বাড়ীতে তারাশঙ্কর বাবুর স্ত্রী অহল্যা-পাষাণী হয়ে আছেন...আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে...কথা হয়েছে...তাঁর মেয়ে রাণুর সঙ্গে ভাব হয়েছে—জানো ?

সুনীতির বিস্ময়ের সীমা নাই !

প্রবীর কহিল—কি করে', শোনো, বলি। যেন রোমান্স! গল্পে-উপন্যাসে যেমন ঘটে, ঠিক তেমনি করে !

প্রবীর বলিল সন্ধ্যার কাহিনী। চুঁচড়া হইতে ফিরিবার পথে দেখা রাণুর সঙ্গে ; সে হারাইয়া গিয়াছিল। তার পর দাসী আর চাকরের সঙ্গে দেখা এবং রাণুর সঙ্গে গিয়া একেবারে উঠিল তারাশঙ্করের গৃহে। দাসী-চাকরের প্রবল প্রতিবাদ...সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই। তার পর...

সুনীতি কহিল,—আপনার এ কথায় সেই রূপকথার গল্প মনে পড়ছে ! পাষাণ-পুরীতে রাজকন্যা পাষাণ হয়ে আছেন—লোকজন, গাছপালা সব পাথর হয়ে আছে—সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে পক্ষীরাজে চড়ে সে পুরীতে এসে নামলেন কোথাকার রাজপুত্র—রাজপুত্রের হাতে সোনার কাঠি ! সে কাঠি ছোঁয়াবামাত্র রাজকন্যার দেহের পাষাণ খশে গেল ! রাজকন্যা চোখ মেলে চাইলেন...রাজপুত্রের গলায় দিলেন বরমাল্য !

পাষাণ

প্রবীর একাগ্র মনে সুনীতির কথা শুনিতেছিল। চোখের সামনে জাগিতেছিল রূপ-কথার পাষাণ-পুরী...সে পুরীতে কন্যা পাষাণ-প্রতিমা—চোখ-মুখ সব আছে—সে-চোখে কিছু দেখে না.. সে-মুখে কোনো কথা নাই···এবং সে যেন কোথা হইতে সে-পুরীতে গিয়া নামিয়াছে! সেই যেন রাজপুত্র—মাথায় সোনার মুকুট!

সুনীতির কথা শুনিয়া চমকিয়া সে বলিল—বরমাল্য!...না, তা কি করে আমায় দেবে?

হাসিয়া সুনীতি বলিল—বাঃ! তুমি বুঝি রূপ-কথার রাজপুত্র?

অপ্রতিভভাবে প্রবীর কহিল—তুমি ভারী চমৎকার করে গল্প বলো ...মনে হয়, যেন জীবন্ত সব চোখে দেখছি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাগান

সেদিন শনিবার। সকাল সকাল অফিসের কাজ সারিয়া প্রবীর গেল মিউনিসিপ্যাল-মার্কেটে। সেখান হইতে বাছিয়া কতকগুলা পুতুল ও খেলনা কিনিয়া বাড়ী ফিরিল।

ফিরিবার পথে গাড়ী থামাইল রাণুদের বাড়ীর সামনে। তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। বড় বড় গাছপালার পিছনে সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে —বিরাম-কামনায়। এত-বড় বাড়ী-বাগান…নিথর নিস্পন্দ! বাহির হইতে দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই যে এ-বাড়ীতে লোকজন বাস করে! সত্যই যেন সেই রূপ-কথার পাথর-পুরী! কাহার অভিশাপে সারা বাড়ী যেন মূক পাষাণ-স্তূপে রূপান্তরিত হইয়া আছে!

সদরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। প্রবীর দ্বারের কড়া নাড়িল; ডাকিল,—বেহারি…

সাড়া মিলিল না। বেহারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল না। যে দ্বার খুলিল, সে দীনেশ।

দীনেশ দূর-সম্পর্কে নীলিমার কি-রকম [illegible] হয়। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ...ছেলেবেলায় নীলিমার পিতার গৃহে আশ্রয় পায় এবং তাঁর আশ্রয়ে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখিতেছিল, এমন সময় নীলিমার পিতার মৃত্যু এবং নীলিমার বিবাহ হইল।

নীলিমাকে বিবাহ করিয়া তারাশঙ্কর দেশে আসিবে, সহসা দীনেশের কথা মনে পড়িল। কহিলেন,—তাইতো, তুমি এখানে একলা কোথায় থাকবে! যাবে আমাদের সঙ্গে?

দীনেশ কোনো জবাব দিল না...

তারাশঙ্কর বলিলেন—কত পর-অনাত্মীয়...তারা আমার ওখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে! আর তুমি আপন-জন...সেখানে তোমার ঠাঁই হবে না, তাও কি হয়! এসো তুমি আমাদের সঙ্গে...তোমার উপর ভার দেবো বিষয়-আশয় দেখবার।...আমি ও-সব খাতাপত্র বুঝি না...খাতা-পত্র দেখলে আমার আতঙ্ক হয়।

এই ভাবে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া তারাশঙ্কর দীনেশকে আনিলেন ফরাশডাঙ্গায় এবং সেই পর্য্যন্ত দীনেশ এখানে রহিয়াছে।

বিবাহ করে নাই। কে বিবাহ দিবে? কলের পুতুলের মতো নির্বিকার ভাবে সে তারাশঙ্করের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেছে—পাওনা-গণ্ডা আদায় এবং সংসার-পরিচালনার কাজ...নীলিমাকে এ সব ব্যাপারে কোনো দিন মাথা ঘামাইতে হয় নাই।

দীনেশ কহিল—কি চান?

এ-লোকটিকে প্রবীর আজ প্রথম দেখিল। কহিল,—রাণুর জন্যে খেলনা এনেছি...তাকে দেবো।

প্রবীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। দীনেশ তার কথা শুনিয়া থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রবীর বুঝিল। কহিল,—বেহারী কোথায়? পার্ব্বতী দাসী? তাদের ডাকুন...আমায় তারা চেনে। আপনি জানেন না। রাণুর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। আর একদিন আমি এ বাড়ীতে এসেছিলুম। মেলা দেখতে গিয়ে রাণু যেদিন হারিয়ে যায়, আপনাদের কর্ত্রীও আমাকে জানেন। আমার সঙ্গে তিনি সেদিন দেখা করেছিলেন।

প্রবীরের কথা শেষ হইলে দীনেশ শুধু কহিল,—ও!

এ-কাহিনী সে শুনিয়াছে। শুনিয়াছে, রাণু হারাইয়া গিয়াছিল এবং একটি বাবু তাকে লইয়া একেবারে কোনো নিষেধ না মানিয়া গৃহে আসিয়া উদয় হইয়াছিলেন; বৌমা নীলিমার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে সে বাবু বিদায় লইয়া যায়!

ইনিই সেই বাবু?

দীনেশ কহিল—আপনি দাঁড়ান। বাড়ীর মধ্যে আমি খপর পাঠাই।

প্রবীর কহিল—আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনি বরং পার্ব্বতীকে ডেকে দিন। আর যদি পারেন, রাণুকেও ডাকবেন!

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দীনেশ চলিয়া গেল অন্দর-মহলে।

সদরের দ্বার পার হইয়া সামনে মস্ত উঠান। উঠানে সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া জমাট বাঁধিতেছে। নিঃশব্দতার সঙ্গে অন্ধকারের সম্পর্ক চিরদিন নিবিড়; তাই সন্ধ্যায় এ পুরীতে নামিতে পাইয়া অন্ধকারের উৎসাহ যেন কিছু বেশী!

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রবীর ভাবিতেছিল, পুরীর এই নিঃশব্দতা, এই

অন্ধকার···তার ইচ্ছা করে, দু'হাতে ছিঁড়িয়া ফাঁশাইয়া দেয়! দিয়া রাণু ও নীলিমার মন বাহিরের আলো-বাতাসে ভরিয়া তোলে! কল্পনার চোখে দেখিতেছিল, এ বাড়ী আনন্দ-হাসিতে আবার যেন জীবন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! ও উঠান চন্দ্র-সূর্য্যের আলোয় আলো হইয়া আছে!

পার্ব্বতী আসিল, প্রবীরকে কহিল,—ও, আপনি!

প্রবীর কহিল—হ্যাঁ। রাণু কোথায়?

পার্ব্বতী কহিল—বাড়ীর মধ্যে বাগানে।

প্রবীর কহিল—তার জন্যে পুতুল এনেছি। তাকে একবার ডাকো।

পার্ব্বতী ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে? গিয়া রাণুকে ডাকিয়া আনিবে? মায়ের নিষেধ! কিন্তু এ লোকটি সেদিন নিষেধের সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন! মা সেজন্য কোনো অনুযোগ তোলেন নাই! এ লোকটির কথা না শুনিলে ওদিক হইতে যদি অনুযোগ ওঠে?

পার্ব্বতী কহিল—আচ্ছা, আমি দেখচি।

পার্ব্বতী চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে রাণু।

প্রবীরকে দেখিয়া রাণুর আনন্দের সীমা নাই! সে বলিল,—আপনি! বা রে!

প্রবীর কহিল,—হ্যাঁ। ত্যাখো তোমার জন্য কি এনেছি।

কাগজে-মোড়া কতকগুলা পুতুল—সেলুলয়েডের বৌ-পুতুল, প্লাশের কুকুর, হাতী, ঘোড়া, খরগোস, দম-দেওয়া মোটর-গাড়ী, রেল-গাড়ী···

রাণু কহিল—এত পুতুল কি হবে? আপনি খেলা করেন, বুঝি?

সোৎসাহে প্রবীর কহিল—হ্যাঁ।

রাণু কহিল—বা রে আপনি বড় হয়েছেন, এখনো পুতুল-খেলা করেন ?

প্রবীর কহিল—এতদিন করিনি, এবার থেকে পুতুল নিয়ে খেলা করবো।

রাণু কহিল—কোথায় খেলা করবেন ?

প্রবীর কহিল—এ বাড়ীতে...তোমার সঙ্গে।

এ কথায় রাণু সচকিত স্তম্ভিত !

প্রবীর লক্ষ্য করিল রাণুর মুখে-চোখে বিস্ময় ও সঙ্কোচ জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রবীর কহিল—তুমি খেলা করবে আমার সঙ্গে ?

রাণু করুণ চোখে চাহিয়া রহিল প্রবীরের পানে ; কোনো জবাব দিল না।

প্রবীর কহিল—আজ নয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তুমি এ সব খেলনা-পুতুল তোমার কাছে রেখে দাও। কাল আমি আসবো। এসে তোমার সঙ্গে খেলা করবো···কেমন ?

সঙ্কোচ-সংশয়ে-ভরা মৃদু স্বরে রাণু কহিল—হুঁ।

প্রবীর বুঝিল, এ জবাবটির পিছনে অনিশ্চয়তার অনেকখানি আতঙ্ক !

ক্ষণকাল রাণুর পানে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া প্রবীর বলিল—মা কি করছেন ?

রাণু কহিল—বাগানে বসে আছে। আমি সেখানে মার কাছে খেলা করছিলুম···

প্রবীর কহিল—কি খেলা করছিলে ?

রাণু কহিল—পুতুল নিয়ে…

প্রবীর কহিল—বেশ, মাকে পুতুল দেখাও গে। দেখে মা কি বলেন, আমাকে এসে বলো। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো…যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসবে…কেমন ?

সানন্দে রাণু কহিল,—আচ্ছা…

ছোট হাত দুটিতে এত খেলনা ধরে না। রাণু চাহিল পার্ব্বতীর পানে, কহিল—ও পারুদি…নাও না ভাই, পুতুল নিয়ে মার কাছে যাবো মাকে দেখাতে।

পার্ব্বতীর দু' চোখের দৃষ্টিতে যেমন [illegible], তেমনি অজস্র প্রশ্ন ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে !…রাণুর কথায় পার্ব্বতী পুতুল-খেলনা লইয়া তার সঙ্গে চলিল…

প্রবীর দাঁড়াইয়া রহিল। দীনেশও একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল…

প্রবীর কহিল—আপনার নায়েব-গোমস্তারা এ বাড়ীতে থাকেনা ?

দীনেশ কহিল—চারজন কর্ম্মচারী আছে…তারা দিনের বেলায় আসে…পাঁচটার সময় চলে যায়।

প্রবীর কহিল—তারাশঙ্কর বাবুর স্ত্রী কোনো-কিছু দেখেন না ?

দীনেশ কহিল—না।

প্রবীর কহিল—এ-সব কে দেখাশুনা করে ?

দীনেশ কহিল—আমার উপর সব ভার।

—এত বিশ্বাস !

দীনেশ কহিল—সম্পর্কে আমি ওঁর ভাই হই…আমরা একসঙ্গেই

মানুষ হয়েছি…আমার কোনো ছেলে-পুলে বা আর-কেউ আপন-জন নেই…

—ও…

প্রবীরের চোখে বিস্ময়…

প্রবীর কহিল—এঁর বিয়ের আগে আপনারা পশ্চিমে থাকতেন ?

দীনেশ কহিল—হ্যাঁ…আম্বালায়…

প্রবীর কহিল—এঁর বাবা কি করতেন ?

দীনেশ কহিল—নীলুর ঠাকুর্দ্দামশায় আম্বালায় কারবার করতেন। বাপের আমলে কারবারে খুব বেশী লোকশান হয়। মানে, নীলুর মা মারা গেলে মেসোমশাই কোনো-কিছু দেখতেন না…তাতেই কারবার নষ্ট হয়…শেষে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। বড্ড সাহেবী চালের মানুষ ছিলেন। ভারী ফিট্‌ফাট্‌। নীলু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল…তারপর অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়ালো,…হঠাৎ তারাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা।… তাঁর সঙ্গে এঁদের দূর-সম্পর্ক ছিল। তারাশঙ্কর বাবু নীলুকে দেখে খুব পছন্দ করেন। ওকে তিনি বিয়ে করেন। দু'জনে বয়সে অনেক তফাত ছিল। বিয়ের সময়ে নীলুর বয়স ছিল পনেরো-ষোল…আর তারাশঙ্কর বাবুর বয়স চৌত্রিশ বছর…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দীনেশ চুপ করিল…

প্রবীর বুঝিল, ঐ বয়সের তফাত্‌ হইতেই শেষে বিরোধ আসিয়া জমিল…নিশ্চয় !

প্রবীর কহিল—তাঁর শোক এঁর খুব বেশী লেগেছে…তাহলেও আপনি ভাই হন, বোঝাতে পারেন না ?

দীনেশ কহিল—চেষ্টা করেছি ঢের···কিন্তু আসলে কোথায় যে কি ঘটলো, আমি তা জানি না। নিরুপায় হয়ে শেষে আমি ও-চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি।

একটু পরে পার্ব্বতী ফিরিল, কহিল—আপনি আসুন···

প্রবীর চলিল পার্ব্বতীর সঙ্গে···

বাড়ীর পিছনে মস্ত বাগান। এককালে এ বাগান সযত্নে সাজানো ছিল, আজ অযত্নে ঝোপে-জঙ্গলে ভরিয়া গেছে। বাগানের এক জায়গায় পাথরে-গাঁথা চাতাল। সেইখানে বসিয়া আছে নীলিমা। অদূরে কতকগুলা খেলনাপত্র ছড়ানো। মায়ের সামনে প্রবীরের দেওয়া পুতুল-খেলনা মেলিয়া রাণু মাকে বুঝাইতেছিল।

প্রবীরকে দেখিয়া রাণু সোৎসাহে বলিল,—ঐ উনি এসেছেন···

মলিন মৃদু হাসি মুখে নীলিমা চাহিল প্রবীরের পানে; সামনের বাঁধানো রোয়াক দেখাইয়া বলিল,—বসুন···

প্রবীর বসিল। বসিয়া নীলিমার পানে চাহিল।

নীলিমা নতমুখী—তেমনি বিষাদের প্রতিমা!

প্রবীর কহিল—রাণুর জন্য ক'টা খেলনা এনেছিলুম···

নীলিমা কহিল—কেন মিথ্যে খরচ করে এ-সব কিনেছেন!

প্রবীর কহিল—আমার তো কেউ কোথাও নেই। একলা থাকতে পারিনা। রাণুর সঙ্গে খেলা করে কথা কয়ে থাকতে হবে তো···তাই। মানে,···আপনার যদি তাতে আপত্তি থাকে···

কথাটা বলিয়া প্রবীর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীলিমার পানে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা হাঁ-না কোনো কথা বলিল না···তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছোট একটু ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতেও প্রকাশ পাইল না।

সাহস পাইয়া প্রবীর কহিল—একটা কথা ক'দিন ধরে আমার মনে হচ্ছে···বলবো ?

চোখ মেলিয়া নীলিমা চাহিল প্রবীরের পানে, কহিল—বলুন···

প্রবীর কহিল—পাশেই গঙ্গা···এমন চুপচাপ বসে শোক-দুঃখের চিন্তা না করে রাণুকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে যদি মাঝে মাঝে বেড়ান··· মানে, এ বয়সে আপনার জীবনে যে ট্রাজেডি ঘটেছে, সে কথা আমি জানি···শুনেছি তো। মানুষ মানুষের দুঃখ-শোক ভোলাতে পারেনা··· কিন্তু তা বলে সে-শোকে ডুবে থাকলেই তো চলেনা···আরো পাঁচজনের উপর আমাদের কর্ত্তব্য আছে। বিশেষ, নিতান্ত যারা অসহায়···আমরা ছাড়া যাঁদের দেখবার আর কেউ নেই, তাদের প্রতি সে কর্ত্তব্য পালন না করলে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে···আমার মুখে এ-সব কথা শোভা পায়না, জানি !···তবু বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো যদি মিনতি জানাই···

এ কথাগুলা প্রবীর বলিতেছিল নীলিমার পানে চাহিয়া। এ কথায় নীলিমার কি ভাবান্তর ঘটে, সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল সুতীক্ষ্ণ। এবং প্রবীর লক্ষ্য করিল, নীলিমার মলিন মুখ এ-কথায় আরো মলিন হইয়া উঠিয়াছে···তার সুকুমার দেহ-বল্লরী এ কথার আঘাতে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে···

একটা নিশ্বাস চাপিয়া নীলিমা কহিল,—কিন্তু···

মুখে আর কথা বাহির হইল না। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে মন ভরিয়া বাকী কথাগুলাকে কোথায় যে চাপিয়া গুঁজিয়া ধরিল···

প্রবীর কহিল—আমি বুঝি। কিন্তু রাণু ডাগর হচ্ছে···ওর জীবনকে আলো-বাতাস দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে! ওকেও যদি আপনার সঙ্গে এ-নির্ব্বাসন ভোগ করতে হয়, তাহলে ভাবুন তো, পঙ্গুতায় ওর জীবন ভরে থাকবে যে! ওর মুখ চেয়ে আপনাকে নিজের দুঃখবেদনা চেপে উঠে দাঁড়াতে হবে···নাহলে এর পরে রাণুর দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না!

নীলিমা বাষ্পোচ্ছ্বাস রোধ করিতে পারিল না। মন এমন হইয়াছে, একটু সমবেদনার স্পর্শ পাইলে অশ্রুর প্লাবনে পরিসিক্ত হইয়া ওঠে! নিরুপায় অসহায়ভাবে সে চাহিল প্রবীরের পানে···দু'টি চোখ বাষ্প-কুয়াশায় ম্লান-মলিন।

প্রবীর কহিল—আপনার এ-ব্যথা আমি মনে-মনে বুঝি! আমার দুর্ভাগ্যও সামান্য নয়। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন...মায়ের কত কথাই না শুনেছি! ছিলেন বাবা···তাঁকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাকেও জানতুম না···সে বাবাও আজ নেই। পৃথিবীর চারিদিকে নানা লোকের ভিড়···নিজের সব দুঃখ চেপে রেখে সে-দুঃখ মাড়িয়ে এ-ভিড়ে মাথা তুলে বেড়াচ্ছি। কি করবো, বলুন? যার উপর হাত নেই, তা নিয়ে হা-হুতাশ করলে তো চলে না! করলে যা নিয়ে থাকতে হবে, তাও হাতছাড়া করে দুর্গতির বোঝা বাড়ানো ভিন্ন আর কোন লাভ হবে না!···আমার কথা বুঝে দেখুন···আমার নিজের ভাই-বোন নেই, কেউ নেই—আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, যদি একটি বোন থাকতো আর সে-বোন এমনি দুঃখে নিজেকে নিমগ্ন রাখতো, তাহলে তাকে ঠিক এমনিভাবেই এ-সব কথা বুঝিয়ে বলতুম...

প্রবীরের কথায় নীলিমার দু' চোখে ধারা বহিল…

প্রবীর ব্যথা বোধ করিল। ইচ্ছা হইতেছিল, নিজের হাতে ও-চোখের জল মুছাইয়া দেয়!…কিন্তু তা দিবার নয়!

কথাগুলা বলা অন্যায় হইয়াছে? একদিনের পরিচয়ে এতখানি দরদ…হয়তো উনি কি মনে করিতেছেন!

প্রবীর কহিল—আপনি আমার এ-কথায় রাগ করেন নি?

মাথা নাড়িয়া নীলিমা জানাইল, না।

রাণু কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মায়ের চোখে বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া সে ডাকিল,—মা…

মায়ের পায়ে রাণুর হাত…

প্রবীর কহিল—মাকে কাঁদতে দিয়ো না রাণু…

রাণু কহিল—মা কথা শোনে না…অনেক সময় একলা থাকলেই মা কাঁদে, দেখেছি…

নীলিমার পানে চাহিয়া প্রবীর কহিল—মেয়ে নালিশ করছে, শুনচেন তো?

এত অশ্রুর মাঝেও হাসির ঝিলিক ফুটিল…মেয়ের পানে চাহিয়া অনুশোচনার সুরে নীলিমা কহিল—কখন্ কাঁদি আমি, দুষ্টু মেয়ে?

—কাঁদো না! বা রে মেয়ে! আমার যেন চোখ নেই! আমি যেন দেখিনি…না? জানেন, যেদিন সেই আপনি এসেছিলেন…সেই যে যেদিন আমি মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলুম…আপনি আমাদের বাড়ী এলেন তো…আপনি চলে যাবার পর মা সেদিন খুব কেঁদেছিল… রাত্রে কিছু খায়নি…

প্রবীর কহিল—বটে !···আপনি খুব কেঁদেছিলেন সেদিন ?

মলিন হাস্তে নীলিমা কহিল—না, না, আমি কাঁদিনি। ওর কথা আপনি শুনবেন না।

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে প্রবীর বলিয়া উঠিল—আপনার ও গোলাপ-ঝাড়টা খুব বনেদী-জাতের দেখচি···অবহেলায়-অনাদরে ও-গোলাপের এ কি দুর্দ্দশা আপনি করেছেন, বলুন তো···আমি গাছ-গাছড়া কিছু চিনি ! এ-জাতের গোলাপ বড়-একটা দেখা যায় না !

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর উঠিয়া গেল গোলাপ-ঝাড়ের কাছে। নানা কাঁটা-গুল্মে বিজড়িত হইয়া গোলাপের [illegible]ন নিষ্ফল বিপর্য্যস্ত হইয়া গেছে। দু' একটা ডাল ধরিয়া টানিয়া প্রবীর ডাকিল,—রাণু···

রাণু সোৎসাহে বলিল,—কেন ?

প্রবীর কহিল—তোমাদের সেই বেহারীকে বলো তো আমাকে একখানা বড় কাঁচি কি ছুরি দিয়ে যাবে। আজকে আমি গোলাপের শত্রু-নিপাত করে এ গাছকে বাঁচাবো।

রাণু ডাকিল—বেহারিদা...

নীলিমা কহিল—সখ করে এ-সব করা হয়েছিল। আমার সখ···

প্রবীর কহিল—তা বুঝেছি। যাঁর স্নেহে এদের জীবন, তিনি যদি না দেখেন, তাহলে এরা বাঁচবে কেন ? শুধু গাছপালা [illegible] মানুষ-জনের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। আজ যদি আপনি একটু মাথা তুলে সবার পানে চেয়ে দেখেন, তাহলে তারাও সত্যিকারের প্রাণ পেয়ে তাজা হয়ে উঠবে।···এই রাণুকেই তখন দেখবেন···

বেহারী আসিলে তাকে কাঁচি আনিতে বলা হইল…এবং কাঁচি আসিলে প্রবীর স্বহস্তে গাছের সেবায় মনোনিবেশ করিল…

গোলাপের পরে গন্ধরাজের গাছ…মল্লিকার ঝাড়…ম্যাগনোলিয়া, একটা বটগাছের গায়ে একরাশ অর্কিড…এখনো শুষ্ক শাখায় বিচিত্র বর্ণের ফুল…

সে ফুল পাড়িয়া প্রবীর রাণুর হাতে দিল। রাণু কহিল—বারে, চমৎকার ফুল!

প্রবীর চাহিল নীলিমার পানে…নীলিমা ফুলের পানে চাহিয়াছিল।

প্রবীর কহিল—জানেন, এ-অর্কিডের জন্মভূমি কোথায়?

নীলিমা কহিল—এ-অর্কিড আনিয়েছিলুম ডেরাডুন থেকে। রাণু হবার আগে একবার ডেরাডুনে গিয়েছিলুম…কি সখই আমার ছিল… গাছপালা ফুল-ফলের উপর প্রাণ একেবারে ঢালা ছিল।

প্রবীর কহিল—ডেরাডুন থেকে আপনি আনলেও এ-অর্কিডের আদিম জন্মভূমি হলো মোঙ্গোলিয়া। এর নাম…সে এক বিশ্রী লাটিন নাম। অনুবাদ করে আমি নাম দিয়েছিলুম 'চিত্ত-রঞ্জনী'। লাটিন কথাটার ইংরেজী অর্থ হয় Heart's Delight…অর্কিড সম্বন্ধে আমি অনেক বই পড়েছি…। এ-ফুলটি অযত্নেও ফোটে…তবে এর গায় অনাদরের চিহ্ন রয়েছে…সাদার গায়ে এই যে ভায়োলেটের তিলক,… যত্ন পেলে এ তিলকের রঙ আরো গাঢ় হতো…অযত্নে এ-রঙ ফিকে হয়ে যেন সাদায় মিশে গেছে…তত বাহার খোলেনি! যত্ন করুন, দেখবেন এ-ফুল আবার heart's delight হয়ে উঠবে।…মানুষের মন বলুন, ফুল বলুন…সবাই যত্ন চায়। অযত্নে কারো বিকাশ হয় না…

নীলিমা নিশ্বাস ফেলিল…তারপর কহিল—সন্ধ্যা হলো…

প্রবীর কহিল—আমি আসি…রাণু। এবার যেদিন আসবো, তোমার জন্ম একটা স্কুটার নিয়ে আসবো…তাতে চড়ে তুমি এ-বাগানে hop করে বেড়াবে…কেমন?

রাণু কহিল—সে কি রকম?

প্রবীর কহিল,—আগে আনি, তার পর দেখবে।

এ-কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইল। বাগান প্রায় পার হইয়াছে, রাণু ডাকিল—শুনছেন…ও-আপনি…

প্রবীর ফিরিল, হাসি-মুখে কহিল—আমার বুঝি নাম নেই? ও-আপনি বলে ডাকছো?

রাণু বলিল,—বা রে, কি বলে আপনাকে ডাকবো, তা তো জানি না।…

রাণু চাহিল নীলিমার পানে।

স্মিত হাস্যে নীলিমা কহিল—মামা হন। ওঁকে মামাবাবু বলে ডাকবে!

প্রবীর খুশী হইল, কহিল—আমি মামাবাবু হই…

এক-মুখ হাসিয়া রাণু কহিল—হ্যাঁ, সেই বেশ। আপনি মামাবাবু… তা মামাবাবু, কবে ঐ স্কুটার আনবেন?

—যদি বলি, কাল…?

রাণু একেবারে গলিয়া গেল, বলিল—হ্যাঁ মামাবাবু, হ্যাঁ, কাল…

খুশী-মনে প্রবীর গৃহে ফিরিল। ভাবিল, এ-পাষাণে প্রাণ-সঞ্চার হয়তো কঠিন হইবে না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নব রঙ্গ

তারপর দুদিন প্রবীর আর ও-বাড়ীতে যায় নাই! রাণুর জন্য খেলনা আনিয়া চিঠি লিখিয়া সে-খেলনা ও-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল···

চিঠি লিখিয়াছিল রাণুকে। জানিত, রাণুর নামে লিখিলেও সে চিঠি নীলিমা পড়িবে।

চিঠিতে লিখিয়াছিল—

স্নেহের রাণু,

কাজে বড় ব্যস্ত আছি। তাই যাইতে পারিলাম না। খেলনা পাঠাইলাম। নিজের হাতে এ খেলনা লইয়া গিয়া তোমার হাতে দিলে কতখানি আমার আহ্লাদ হইত, তুমি ছেলেমানুষ তাহা বুঝিবে না। তবে এখানে বসিয়া আমি দেখিতেছি, তোমার মনে আনন্দের ঝর্ণা বহিয়াছে।

আশা করি তুমি ভালো আছো, তোমার মা ভালো আছেন।

মামাবাবু

কোনো কাজ ছিল না। প্রবীর ইচ্ছা করিয়া গেল না! নীলিমাকে দেখিয়া মন তার সঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে চায় না! মনে হয়, কথার পর

কথায় মনের যেখানে যত-কিছু ব্যথা-বেদনা আছে, নৈরাশ্য আছে, যাতনা আছে, সমস্ত নিঃশেষে নিষ্কাশিত করিয়া নীলিমার মনে সে অজস্র আলো, বাতাস, পুষ্প-সুরভি ঢালিয়া দেয়···

আবার পরক্ষণে নিজের মনে নিজেকে সে প্রশ্ন করে, তোমার এ সাধ এমন উগ্র হয় কেন ?···কেন ? তাই সে নিজের মনকে প্রাণপণ-বলে দাবিয়া শাসনে রাখিতে চায়—না...উনি যদি নিঃসঙ্গ বিজন বাসকেই কাম্য ভাবিয়া থাকেন, জোর করিয়া তাঁর সে নিঃসঙ্গতা এভাবে কেন সে বিপর্য্যস্ত বিচূর্ণ করিবে ? প্রবীরের ভালো লাগিতে পারে, তাই বলিয়া তাঁরও ভালো লাগিবে, এমন কি কথা আছে ! তবে এ-কথা সত্য, পাষাণ গলিয়াছে...পাষাণের বুকে মনের স্পন্দন...

সেদিন সন্ধ্যার সময় মন অধীর হইয়া উঠিল। বিল, একবার যাই। নহিলে তিনি কি ভাবিবেন···

বাহির হইতেছে, এমন সময় কৈলাস চাটুয্যে আসিয়া দেখা দিলেন।

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—বেরুচ্ছ ?

প্রবীর কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ...

—কোথাও কাজ আছে ?

জবাব দিতে গিয়া কথা বাধিল। প্রবীর নিজেও তাহা লক্ষ্য করিল··· লক্ষ্য করিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। কোনোমতে সে বলিল—কাজ এমন নয়, মানে একটু বেড়িয়ে আসবো, ভাবছিলুম।

কৈলাস চাটুয্যে কহিলেন—ক'দিন আমাদের ওখানে যাওনি···উনি তাই আমাকে পাঠালেন। মানে, তোমার মাসিমা...বললেন, কেমন আছে, গিয়ে একবার দেখে এসো।

প্রবীর কহিল—ভালোই আছি···মাসিমাকে বলবেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ভালো না থাকলে নিশ্চয় খপর দিতুম! অসুখ হলে মাসিমার স্নেহ-পরিচর্য্যা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবো, এমন দুর্বুদ্ধি আমার কখনো হবে না!

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—বেড়াতে যাচ্ছো তো...তা অমনি একবার তোমার মাসিমার সঙ্গে যদি দেখা করে যাও, বাবা...

কৈলাসের স্বরে কুণ্ঠা! তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রবীর কহিল—বেশ, চলুন...

কৈলাসের সঙ্গে প্রবীর আসিল কৈলাসের গৃহে। অন্দরের মুখে আসিয়া কৈলাস কহিলেন—এনেছি গো তোমার প্রবীরকে...

অন্দরের খোলা রোয়াকে বসিয়া হেমপ্রভা সুনীতির কেশ রচনা করিতেছিলেন, অদূরে বসিয়া দাসী আনাজ-তরকারীর ব্যবস্থা বুঝিয়া লইতেছিল; প্রবীর আসিয়া ডাকিল—মাসিমা···

মাসিমা সুনীতির কেশ রচনা করিতেছেন দেখিয়া প্রবীর দু' পা পিছাইয়া গেল...

সুনীতি কহিল—প্রবীরদার লজ্জা হয়েছে মা...সরে গেল।

হেমপ্রভা কহিলেন,—সে কি বাবা...তুমি ঘরের ছেলে...লজ্জা কিসের? এসো।......প্রবীর আসিল।

হেমপ্রভা বলিলেন—ক'দিন এদিক মাড়াওনি...ভাবনা হয়েছিল।

উনি বেরুচ্ছিলেন, তাই। নাহলে ভাবছিলুম, সুনীতির চুল বেঁধে দিয়ে নিজে গিয়ে আমি দেখে আসবো।

হাসিয়া প্রবীর বলিল—তা জানলে আমি আসতুম না। আমাদের ওখানে মাসিমার পায়ের ধূলো একদিনও পড়লো না...এতদিন এখানে বাস করছি...

হেমপ্রভা কহিলেন—এ-কথা তুমি বলতে পারো, বাবা। কিন্তু সত্যি-কথা কি জানো, তোমাদের বাড়ী যেতে পা যেন ওঠে না! একদিন ঐ বাড়ীতেই আমার দিন কেটেছে। নিজেদের এখানে দিনের বেলায় কতটুকু বা থাকতুম!

সুনীতি চুপ করিয়া ছিল; প্রবীর কহিল—সুনীতির কি খপর? সুরলক্ষ্মীর সাধনা হচ্ছে তো? না...

সুনীতি মুখ গম্ভীর করিয়া বসিল।

হেমপ্রভা কহিল—জবাব দিলি না যে নীতি

সুনীতি কহিল—বয়ে গেছে জবাব দিতে! অ[illegible] রাগ করেছি...

হেমপ্রভা কহিলেন—শুনলে তো বাবা...

প্রবীর কহিল—আমিও রাগ করতে জানি...

সুনীতি কহিল—বারে, তুমি কেন রাগ করবে?

হাসিয়া প্রবীর কহিল—এই তো কথা ক[illegible]।...রাগ তাহলে গেছে?

সুনীতি কহিল—হ্যাঁ, রাগ গেছে! রাগ আছে...খুব আছে।

প্রবীর কহিল—তাহলে আমার সঙ্গে কথা কইলে কেন?

সুনীতি মায়ের পানে চাহিল; কহিল—ও বুঝি কথা কওয়া হলো?

হাসিয়া হেমপ্রভা কহিলেন—কথা কওয়া হলো বৈ কি। ও-কথা তুই প্রবীরকেই তো বললি...

সঝঙ্কারে সুনীতি কহিল—কখনো নয়! ও-কথা আমি বলেছি মনে-মনে...

প্রবীর কহিল—থাক্ মাসিমা। মনে মনে ও কত কথা কয়, দেখা যাক। আসুন, আপনাতে-আমাতে কথা কই! সুনীতি কথা না কইলে আমাদের কথা কওয়া বন্ধ থাকবে, ভেবেছে ও। হুঁঃ, একেই বলে, বুদ্ধি!

সুনীতি কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার বুদ্ধি থাক না থাক, তাতে আর কারো এসে যায় না! তুমি বারণ করো মা, আমার বুদ্ধি নিয়ে যেন আর-কেউ আলোচনা না করে!

প্রবীর কহিল—ও-বারণ কে শুনবে, মাসিমা? আলোচনার নিয়মই হলো, যার সম্বন্ধে আলোচনা, তার মতামত নেবার কোনো দরকার নেই।...আপনি আমার কথার জবাব দিন্ মাসিমা।

সুনীতি মাথা টানিল, হেমপ্রভা বলিলেন,—ও আবার কি হচ্ছে?

সুনীতি বলিল—না, আমি এখানে বসবো না। তুমি ছাড়ো আমার মাথা...

প্রবীর কহিল—এ দেখছি, চমৎকার! মানুষ বাড়ী এলে মানুষ রাগ করে! বাঃ!

—আমার খুশী, আমি রাগ করবো...

প্রবীর কহিল—আমারো খুশী, আমি আলোচনা করবো!

মায়ের উদ্দেশে সুনীতি ঝঙ্কার তুলিল—তোমার জন্যেই তো··· বাবা রে, গেলুম! আমার মাথাটাকে যেন কাঠ পেয়েছো...না?

বেণী-রচনার শেষ দিকে খোঁপা তুলিয়া হাতের চাপ দিয়া হেমপ্রভা কহিলেন—নাও বাপু···আমার হয়েছে···যাও, কোথায় যাবে।

মুখখানা ঘোরালো করিয়া সুনীতি কহিল—আমি যদি না যাই...

হাসিয়া হেমপ্রভা কহিলেন—তুই তো নিজেই বললি, যাবি। আমরা কি তোকে যেতে বলেছি? তোর ইচ্ছা হয়, যাবি...কে মানা করেছে?

সুনীতি কহিল—মানা করলেই বা সে-মানা কে শুনছে?...আমি উঠে যাই, আর ওঁরা বসে-বসে আমার কথা নিয়ে পুরাণ রচনা করুন! বটে! না, আমি যাবো না...কি তোমাদের আলোচনা আছে, করো...

প্রবীর কহিল—শুনলেন মাসিমা, অহঙ্কারের কথা! ওঁর কথা নিয়ে আমরা পুরাণ রচনা করবো। উনি নিকষা, সূর্পনখা?...পুতনা না, মন্থরা?

সুনীতি কহিল—কেন আমাকে মন্থরা বলবে মা

প্রবীর কহিল—কেন বলেছি শোনো। বুঝিয়ে ছি! যেতে যেতে থেমে পড়া, তাকে বলে মন্থর···মন্থরার স্ত্রীবাচ্যে হয় া!

সুনীতি কহিল—ওঃ, শুধু কবি কালিদাস না···কালিদাস-মল্লিনাথ তুই···নাঃ, আমি এখানে থাকবো না···কখ্খনো না।

বলিয়াই সুনীতি উঠিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

হেমপ্রভা হাসিলেন। প্রবীর হাসিল।

হাসিয়া প্রবীর কহিল—আপনার এ মেয়েটির মাথায় ছিট্ আছে মাসিমা···

দ্বারের ওদিক হইতে জবাব আসিল—হ্যাঁ, আছে ছিট্···পাঠাও এবার আমাকে রাঁচিতে!

তারপর পায়ে দুম্‌দাম্ শব্দ তুলিয়া সুনীতির অন্তর্ধান।

হেমপ্রভা কহিলেন—কলকাতা থেকে আজ কখন ফিরলে?

প্রবীর কহিল—বেলা চারটেয়।

—কিছু খেয়েছো?

—খেয়েছি। ও-সব কাজ একেবারে রুটীনে বাঁধা, মাসিমা! মধুদা আছে...তার সব কাজ নিক্তির মাপে। খাওয়ানো-দাওয়ানো বা অভ্যর্থনায় এতটুকু খুঁত পাবেন না।

হেমপ্রভা কহিল—ছোট বয়স থেকে মানুষ করেছে...মায়া মমতা আছে। একালের চাকর-বাকর নয় যে শুধু মাইনে নিতে জানবে; কাজ-কর্ম্মের দশা যা হয় হোক্ গে...

হেমপ্রভা সস্নেহ দৃষ্টিতে প্রবীরের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বুকের মধ্যে স্নেহের সাগর ফুঁপিয়া উঠিতেছিল ...চমৎকার ছেলে... শুধু তাই নয়। এ ছেলেটির হাতে সুনীতিকে সঁপিয়া দিয়া যদি বুকের মণি করিতে পারেন!

কতবার ভাবিয়াছেন, এবার প্রবীরের দুটি হাত ধরিয়া বলি, বাবা প্রবীর, মেয়ের মায়ের মনে কত দুশ্চিন্তা, কত উৎকণ্ঠা! তুমি যদি দয়া করিয়া...

কিন্তু মুখ দিয়া এ কথা কিছুতে বাহির হইতে চায় না। ভিতর হইতে মন সবলে কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরে···না, না, এ কি বলিতে চলিয়াছিস্! আরো দুদিন যাক...ভালো করিয়া প্রবীর তোর পরিচয় পাক্...

প্রবীর কহিল—আমাকে ডেকেছিলেন মাসিমা?

হেমপ্রভা কহিলেন—হ্যাঁ বাবা...মানে, সুনীতির দু'একটা সম্বন্ধ আসছে···

সাশ্চর্য্য স্বরে প্রবীর কহিল—সুনীতির বিয়ের ব্যবস্থা করছেন?

হেমপ্রভা কহিলেন—করবো না? শোনো ছেলের কথা! ডাগর হয়েছে। ও-বয়সের ঢের আগে যে তোমার মার আর আমার বিয়ে হয়েছিল...

প্রবীর কহিল—সেকালে যা হতো, একালেও ঠিক তাই হবে মাসিমা? সেকালে ট্রেণ আর নৌকো ছাড়া আপনারা কলকাতায় যেতে পারতেন না...একালে মোটর-গাড়ী হয়েছে...

হাসিয়া হেমপ্রভা কহিলেন—শোনো কথা। মেয়ের বিয়ে, আর মোটরে চড়ে কলকাতায় যাওয়া—দুই এক হলো?

প্রবীর কহিল—এক না হোক, দুয়ে তফাৎ বি[illegible]নেই। তা যাক, বলুন, যা বলছিলেন...

হেমপ্রভা কহিলেন—তা কোনো পাত্রই আমাদের পছন্দ নয়; প্রথমতঃ পাড়াগাঁয়ের বর। সুনীতিকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছি...আমাদের সাধ, কলকাতার কোনো বড় ঘরে লেখাপড়া-জানা, একালের মতো একটি যোগ্য ছেলে আনবো। তা, তোমার মেসোমশাই দেশের কাজ নিয়ে

দিন-রাত এমন মত্ত আছেন যে ঘরের কোনো বিষয়ে তাঁর মন পাবার জো নেই! তাই তোমাকে বলা···কলকাতায় তোমার জানাশোনা ভালো পাত্র যদি থাকে...

হাসিয়া প্রবীর কহিল—জানাশোনা ছেলে বহুৎ আছে মাসিমা। কিন্তু তারা পাত্র-হিসাবে কেমন, তা বলা শক্ত! বন্ধুত্ব আছে অনেকের সঙ্গে...কিন্তু সে সব বন্ধু ঘরের লোকের কাছে কি বস্তু, সে পরিচয় কি একালে পাওয়া যায় যে পাত্র-হিসাবে তাকে ধরে আনবো!

হেমপ্রভা চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিয়াছিলেন, প্রবীরের উত্তরে যদি তেমন একটু আভাস জাগে...

কিন্তু সে-আভাস জাগিল না।...

সহসা দোতলা হইতে বেতালে বেসুরে গানের স্বর ভাসিয়া আসিল—

আঁধার আসিছে নেমে মাঠে-ঘাটে তরু-শিরে ;
নীরব প্রেমের ব্যথা হিয়া রাখে ঘিরে।...

প্রবীর কহিল—উঠতে হলো মাসিমা...সুনীতির রাগ ভাঙ্গাতে হবে। নাহলে রাগ-রাগিণীকে মেরে সে আজ চুরমার করে দেবে! কি বিশ্রী সুরে গানটা গাইতে সুরু করলে, বলুন দিকিনি!

এ গানটি কদিন আগে সুনীতি শিখিয়াছে প্রবীরের কাছে; শিখিয়া ঠিকই গাহিত। আজ...

প্রবীর আসিয়া দু'হাতের আঙুল দিয়া হার্ম্মোনিয়মের রীডগুলি চাপিয়া ধরিল...একটা কর্কশ রব উঠিল।

চেয়ার ছাড়িয়া সুনীতি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—নিজের মনে গান গাইতেও পাবো না...বা রে! ওঁদের হাতে জেলখানার কয়েদী হয়ে থাকতে হবে?

প্রবীর কহিল—কয়েদী নও।...গান গাও,—কিছু বলবো না...কিন্তু যদি গানের প্রাণ বধ করো...

প্রবীর হাসিল।

সুনীতি বলিল—তাহলে আমারো প্রাণ বধ করবে?

হাসিয়া মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে প্রবীর কহিল—না। যদি সুর ভুলে গিয়ে এমন বেসুরে গাও, তাহলে গানটির সুর শিখিয়ে দেবো।

দু'চোখে বিজয়ের দীপ্ত-রেখা···হাসি চাপিয়া সুনীতি কহিল—আপাততঃ তাহলে Peace করছেন? বেশ।···গানটি গেয়ে শিখিয়ে দিন মাষ্টার মশাই।

কথার শেষে গলায় আঁচল দিয়া সুনীতি দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিল।

চমৎকার ভঙ্গিমা! প্রবীর কহিল—ভালো শিষ্য পেয়েছিলুম বটে! বলিয়া প্রবীর চেয়ারে বসিল, বসিয়া গাহিল,—

আঁধার আসিছে নেমে মাঠে ঘাটে তরু-শি...

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সহযোগী

সেদিন সারা রাত্রি প্রবীর ভালো ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম আসে, সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে ভাসিয়া আসে স্বপ্নের তরী! সে তরীর বুকে নীলিমা বসিয়া আছে মলিন-মুখী। নদীর তীরে শ্যামল বনানী-কুঞ্জ— লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না! প্রবীর যেন ঘাটের-কিনারে বসিয়া আছে! শূন্য ঘাট! নীলিমার তরী ঘাটে আসিয়া লাগিল। নীলিমাকে হাত ধরিয়া ঘাটে নামাইবে বলিয়া প্রবীর উঠিল...অমনি হাসির কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে পিছন হইতে সবলে কে তাকে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া প্রবীর দেখে, সে হাস্যমুখী আর কেহ নয়—সুনীতি!

সুনীতির পানে চাহিয়া প্রবীর আবার চাহিল নদীর বুকে...নীলিমার তরী ঐ চলিয়া যায়...ঘাট ছাড়িয়া কোন্ অকূলের উদ্দেশে!...

স্বপ্ন কি একটি! বারে-বারে নব-নব স্বপ্ন আসিয়া দু'চোখে কি পরশ যে বুলাইয়া দেয়! সে স্বপ্নে কখনো আসিয়া দাঁড়ায় নীলিমা...কখনো সুনীতি!...

প্রবীর ভাবিল, এ কি বিপদ! কেন এরা এমন করিয়া মনের দ্বারে

বারে-বারে আসিয়া দাঁড়ায়? সে শুইতে পারিল না...সারা দেহ-ম
তাতিয়া উঠিল। প্রবীর বারান্দায় আসিল।

প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় ছিল একখানা ইজি চেয়ার। প্রবী
সেই ইজি চেয়ারে বসিল।

নিস্তব্ধ নিশীথ...মেঘ-ভাঙ্গা আকাশের বুকে এক-টুকরা মলিন চাঁদ
চাঁদের আলোয় সে বিমল আভা নাই! মলিন জ্যোৎস্না! সে মলিন
জ্যোৎস্নায় চারিদিক অস্পষ্ট!

প্রবীর নিজের মনের মধ্যে সন্ধান করিতে লাগিল—কোথা হইতে এ
স্বপ্নের সৃষ্টি! মৌন মূক পাষাণ-কারায় নীলিমা ছিল বন্দিনীর মতো! সে
পাষাণের গায়ে রেখার আঁক পড়িত না! সে পাষাণ-প্রতিমার কাছে গিয়া
দাঁড়াইবে, এমন স্পর্দ্ধা কাহারো ছিল না! প্রবীর অবাধে সে প্রতিমার
কাছে গিয়াছিল। শুধু যাওয়া নয়...সে পাষাণের বুকে যে জীবন-ধারা
বহিয়া চলিয়াছে, সে জীবন-ধারার পরিচয় সে পাইয়াছে! পরিচয়ের
উপরে আর যাহা পাইয়াছে,...যে-প্রীতি, যে-মায়া...তাহা পাইয়া প্রবীরের
জীবন যেন বিচিত্র-রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।...

দিনে কত-বার নীলিমার কথা মনে উদয় হয়! মনে হয়, পাষাণ-বুকে
যত বেদনা-ব্যথা জমিয়া আছে, সে ব্যথা-বেদনার চাপে মুঞ্জরিত যত
আশা-বাসনা মূর্চ্ছাতুর পড়িয়া আছে, সেগুলি যদি সে দেখিতে পাইত...

হঠাৎ মনে হইল, পিছন হইতে স্নীতি ডাকিতেছে—প্রবীরদা...

প্রবীর পিছনে তাকাইল...কেহ নয়! তবু মনে হইল, যেন হাসির
দমকা বাতাসের মতো স্নীতি আসিয়াছিল এবং চিরাভ্যস্ত কৌতুকের
ভঙ্গীতে ডাকিয়াই কাছে কোথায় লুকাইয়াছে। বাতাসে যেন তার

কেশের সুরভি, হাসির হিল্লোল এখনো মিশিয়া রহিয়াছে! মিলাইয়া যায় নাই!

নীলিমাকে সবলে ঠেলিয়া সরাইয়া মনের উপর সুনীতি এমন আধিপত্য বিস্তার করিল যে তার দাপটে নীলিমা বেচারীর মতো মনের কোণে দাঁড়াইতে পারিল না...সরিয়া গেল!

সুনীতি! জীবনের এমন হিল্লোল প্রবীর কখনো দেখে নাই! তার কাছ হইতে দূরে থাকো, সুনীতি হয়তো ডাকিবে না! কিন্তু একবার সুনীতির কাছে গিয়া দাঁড়াও, হাস্যে-ভাষ্যে সে একেবারে অভিভূত করিয়া দিবে! তার সান্নিধ্য ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার কথা মনে জাগিবে না!

প্রবীরকে সেদিন উদাস দেখিয়া গান লইয়া কি কাণ্ড না করিয়া বসিল! শুধু সেদিন কেন, তার আগে আর একদিন...আরো একদিন...

আশ্চর্য্য! কদিন বা প্রবীর তাকে চিনিয়াছে, জানিয়াছে! তবু এই কয়দিনেই মনে হয়, সুনীতির সঙ্গে যেন প্রবীরের কত-কত কাল এমনি হাস্যে-ভাষ্যে-লাস্যে দিন কাটিয়াছে...

সুনীতি আর নীলিমা···নীলিমা আর সুনীতি! বার-বার দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া প্রবীর মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, নীলিমা যদি কোনদিন তার পাষাণ-আবরণ চূর্ণ করিয়া ও-পাষাণের পরশ হইতে মুক্তি পায়···

সেদিনকার সেই নীলিমা...

এ কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমে দুই চোখ আচ্ছন্ন হইয়া

চেতনার বিলোপ ঘটিল...মধুর কথায় ধড়মড়িয়া উঠিয়া প্রবীর কহিল,—কি খপর মধুদা ?

মধু কহিল—এখানে ঘুমোচ্ছো দাদাবাবু !

প্রবীরের হুঁশ হইল। তাইতো, সকাল হইয়াছে...চারিদিকে রৌদ্রের হিল্লোল। মনে পড়িল, কাল রাত্রে সেই নূতন রকমের স্বপ্ন দেখা !

বলিল—ঘরে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল মধুদা, তাই এক সময়ে এখানে বেরিয়ে এসেছি...

মধু কহিল—ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্ নেই, ব্যবস্থা করলেই পারো।

প্রবীর কহিল—না। ও সব সহুরে জিনিষ এনে এখানকার বিশেষত্ব আমি নষ্ট করতে চাই না মধুদা···তা যাক, কি বলছিলে ?

মধু কহিল—হ্যাঁ।···বাইরে কে দীনেশ বাবু এসে বসে আছেন... দেখা করতে চাইছেন। বললেন, খুব বেশী দরকার আছে।

দীনেশ বাবু ? খুব বেশী দরকার। তার মানে ?

বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল। কোনো-কিছু উপদ্রব ঘটিল না কি ?

প্রবীর কহিল—আমি এখনি যাচ্ছি মধুদা·· মুখ ধুয়ে...তুমি গিয়ে বলো...

মধু চলিয়া গেল।

প্রবীর মুখ-হাত ধুইয়া তখনি নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, নীচে বসিবার ঘরে মলিন বিশুষ্ক মুখে দীনেশ বসিয়া আছে। মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন কত কাল ঘুমায় নাই !

প্রবীরকে দেখিয়া দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রবীর কহিল—আপনি হঠাৎ এ-বাড়ীতে এ-সময় ?

দীনেশ বলিল—নীলু পাঠিয়ে দিলে। বাড়ীতে রাণুর বড় অসুখ।

—রাণুর অসুখ! কবে থেকে? সেদিন আমি গিয়েছিলুম, দিব্যি ছিল...

দীনেশ কহিল,—হ্যাঁ। মানে, পরশু রাত্তির থেকে জ্বর হয়েছে। কাল দুপুর বেলা থেকে একেবারে বেঘোর বেহুঁশ! চুঁচড়ো থেকে সিভিল সার্জ্জন আনা হয়েছিল, তাছাড়া এখানকার ডাক্তার হরকালী বাবু আছেন। তিনি বলচেন, এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না, কি জ্বর!

প্রবীরের বুকে কে যেন খোঁচা মারিল! কাল ও-বাড়ীতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া সুনীতিদের বাড়ীতে কি করিয়া সেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রহিয়া গেল! সুনীতির হাসি-তামাসা কথা-গান বড় ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া?

প্রবীর কহিল—কাল আমাকে এ খপর কেন দ্যান্‌নি দীনেশ বাবু?

দীনেশ কহিল—জানেন তো...না বললে নিজের ইচ্ছায় আমাদের কোনো-কিছু করতে কেমন ভয় হয়!...অনেকবার আমার মনে হয়েছিল, এসে আপনাকে খপর দিই...

প্রবীর কহিল—উচিত ছিল। তা এখন...

দীনেশ বলিল,—কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে রাণু কেবলি ঝেঁকে ঝেঁকে উঠেছে...আপনাকে ডেকেছে। তাই আজ সকাল হতেই নীলু আমাকে বললে, আপনাকে একবার খপর দিতে...যদি আজ একবার দয়া করে যান!

প্রবীর কহিল—দয়া! না, না...আমি এখনি যাচ্ছি। তা আজ সকালে কেমন দেখে এসেছেন?

দীনেশ বলিল—টেম্পারেচার নেওয়া হয়েছিল,—১০৪। মাথায় আইস্‌ব্যাগ্‌ দিয়ে কাল সারা রাত...

শিহরিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রবীর কহিল—বটে! আপনি যান, যান। এখানে দেরী করবেন না।...না, দাঁড়ান, আমার এখান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে যান বরং...চা এখনি দেবে... খেয়ে আপনি চলে যান। আমি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুবো...

প্রবীর আসিয়া দেখে, রাণু বিছানায় শুইয়া আছে...ঝড়ের আঘাতে মূর্চ্ছাতুর বিহঙ্গশিশুর মতো! তার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে নীলিমা! নীলিমার পা ছ'খানা কোনোমতে মাটী ছুঁইয়া আছে! চেহারা দেখিলে চেনা যায় না, সেই নীলিমা! পাষাণময়ী হইলেও মূর্ত্তি ছিল প্রতিমার মতো; এখন সে-প্রতিমা নাই! এ যেন সে প্রতিমার স্মৃতিরেখা...কঙ্কালমাত্র!

মেয়ের ভাবনায় নীলিমা এমন তন্ময় যে প্রবীর আসিয়াছে, সে তাহা জানিতে পারে নাই।

প্রবীর কহিল—টেম্পারেচার এখন কত?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর অগ্রসর হইল বিছানার দিকে। নীলিমা মাথা তুলিয়া অসহায়ের মতো করুণ-কাতর কণ্ঠে কহিল—১০৪...একটু আগে দেখেছি...

তার মুখে কি ম্লানিমা! প্রবীর কহিল—ডাক্তার বলেছেন, এখনো ঠিক করতে পারছেন না?

—না।

প্রবীর রাণুর পানে চাহিয়া রহিল···অসুখ-বিসুখের চেহারা এ জীবনে সে বড়-একটা দেখে নাই! তবু শুনিয়া যেটুকু পরিচয় পাইয়াছে, সে-কথা স্মরণ করিয়া প্রবীর শিহরিয়া উঠিল। সে কোনো কথা বলিতে পরিল না।

তার এ স্তব্ধতায় নীলিমা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! নিমেষে তার চেতনা বিলুপ্ত হইল। সে একেবারে প্রবীরের পায়ের উপরে পড়িয়া একান্ত নিরুপায়ে আশ্রয় ও সাহায্য পাইবার বাসনায় প্রশ্ন করিল—খুব কি শক্ত অসুখ? রাণু বাঁচবে না?

তার দু'চোখে অশ্রুর ঝর্ণা।

সস্নেহে নীলিমার হাত ধরিয়া প্রবীর কহিল—অসুখ শক্ত, তাবলে ও-সব মন্দ কথাই বা মনে আনেন কেন? এ বয়সে ছেলেমেয়েদের অমন কত শক্ত অসুখ হয়—সে অসুখ সারে। আপনি মন খারাপ করবেন না। অসুখ যত শক্ত হবে, আমাদের মনকেও ঠিক ততখানি শক্ত করতে হবে। মন দুর্ব্বল হলে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারবেন কেন? ছি···চোখের জল মুছুন...

বাষ্প-জড়িত স্বরে নীলিমা বলিল,—আমার কেবলি কান্না পাচ্ছে। আমার যে আর কেউ নেই, প্রবীর বাবু...

প্রবীর কহিল—আমরা আছি...এত লোক...সকলে মিলে সেবায়-শুশ্রূষায় রাণুকে নিশ্চয় ভালো করে তুলবো। আপনি কাঁদবেন না। বুকে বল চাই।

কাঁদিয়া প্রবীরের পায়ের কাছে নীলিমা বসিয়া পড়িল...প্রবীরের

পায়ে হাত রাখিয়া নীলিমা কহিল—আমার বড্ড ভয় করছে।...আপনি জানেন না...আমি কত বড় মহাপাপ করেছি! ভয় হয়, সেই পাপেই বুঝি আমাকে মহাশাস্তি ভোগ করতে হবে!...আপনি ওকে ভালো করে দিন। আপনার পায়ে চিরকাল আমি কেনা বাঁদী হয়ে থাকবো...

চমকিয়া হঠাৎ রাণু ডাকিল—মা...

প্রবীর চাহিল রাণুর পানে; কহিল,—চুপ! রাণু ডাকছে।

নীলিমা চোখের জল মুছিল; মুছিয়া রাণুর কাছে আসিল, কহিল—কে এসেছেন, দেখেছো রাণু?

মাকে ডাকিয়া রাণু তখনি চোখ বুজিয়াছিল...চোখ বুজিয়াই জড়িত স্বরে মায়ের কথার জবাবে বলিল—কে?

নীলিমা কহিল,—মামাবাবু...

রাণু কোনো জবাব দিল না, চোখ চাহিল না; ঠোঁট দুটি শুধু নড়িল ...অতি মৃদু।

নীলিমা মেয়ের পানে চাহিয়া পাথরের মূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রবীর কহিল—কিছু খেতে দিয়েছেন?

নীলিমা কহিল—একটু বেদানার রস খাইয়েছি...

—কতক্ষণ?

নীলিমা কহিল—রসটুকু খাইয়েই দীনেশদাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম...

—ডাক্তার-বাবু কখন্ আসবেন?

—সকালের দিকে তিনি আসেন বেলা নটায়।

—হুঁ...তা বেশ, রাণু এখন ঘুমোচ্ছে তো...আপনি যান্। গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে আসুন। আর যদি পারেন, স্নানটুকু সেরে নিন্।

অত্যন্ত অসহায়ের দৃষ্টিতে নীলিমা চাহিল প্রবীরের পানে।

প্রবীর কহিল—আপনিও বোধ হয় কাল থেকে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেছেন?

নীলিমা কহিল,—না, সকালে নেয়েছি-খেয়েছি।

—রাত্রে নিরম্বু উপবাস দেছেন?

নীলিমা কোনো কথা কহিল না; ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রবীর কহিল,—কাল আমাকে একটা খপর দিলে কিছু অন্যায় হতো কি?

নীলিমা কহিল—রাত্তিরের দিকেই অসুখটা হঠাৎ বাড়লো কি না···

প্রবীর কহিল,—তখনই কোন্ খপর পাঠিয়েছিলেন...

—তখন অনেক রাত্তির···

প্রবীর কহিল—হলোই বা অনেক রাত্তির!

নীলিমা কোনো জবাব দিল না···এমন স্নেহের ভর্ৎসনায় তার বুক গলিয়া গেল!

প্রবীর কহিল,—যাক, যা হয়ে গেছে, তার উপায় নেই। তবে আজ থেকে রাণুর সেবার ভার আমি নিলুম। আপনি যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন···আর এখানে আসবার সময় বেশ এক কেট্‌লি চায়ের ব্যবস্থা করে আসবেন। দীনেশবাবুকে বরং একবার ডাক্তার-বাবুর কাছে

যেতে বলুন···তিনি যত শীগ্‌গির পারেন, যেন আসেন। পথ্যাপথ্যের রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে!...

নীলিমার মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। স্খলিত স্বরে সে কহিল—কেন, ভয়ের কিছু দেখছেন?

প্রবীর কহিল,—না। তবে সব বিষয়ে হুঁশিয়ার হওয়া উচিত তো!

মুখ-হাত ধুইয়া নীলিমা ফিরিল আধঘণ্টা মধ্যে। তার সঙ্গে আসিল পার্ব্বতী; পার্ব্বতীর হাতে চায়ের সরঞ্জাম। রাণুর মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়া প্রবীর বসিয়া আছে।

প্রবীর কহিল—দুটো পেয়ালা চাই।

পার্ব্বতী আর-একটা পেয়ালা আনিল। প্রবীর কহিল—দীনেশবাবু ডাক্তারের বাড়ী গেছেন?

পার্ব্বতী কহিল—গেছেন।

প্রবীর কহিল—তুমি একটি কাজ করো পার্ব্বতী···আমার বাড়ীতে একটা খপর পাঠাও। আমাদের বাড়ীতে মধুদা আছে...তাকে বলে পাঠাও, মধুদা যেন একবার এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

পার্ব্বতী চলিয়া গেল। নীলিমা খাটের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল...

প্রবীর কহিল—বাঃ, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে! কাজ নেই বুঝি? দু'পেয়ালা চা চাই এখনি···পেয়ালায় চা ঢালুন...

যন্ত্র-চালিতের মতো নীলিমা আদেশ পালন করিল। প্রবীর কহিল—একটি পেয়ালা আপনি মুখে দিন…আর একটা পেয়ালা আমি নি।

নীলিমা এ কথায় চুপ করিয়া রহিল।

প্রবীর কহিল—আপনি চা না খেলে আমি খাবো না, সত্যি!

নীলিমা কহিল,—আমি চা খাই না।

প্রবীর কহিল—মেয়ে সেরে উঠলে খাবেন না। মেয়ের অসুখ যে কদিন থাকে আর মেয়েকে যে কদিন সেবা করতে হবে, সে কদিন আমি চা খাবো…আপনাকেও চা খেতে হবে, বুঝলেন…

নীলিমা তবু নড়িল না…কোনো কথা বলিল না।

প্রবীর কহিল,—আপনি যদি এভাবে নিজের জেদ বজায় রেখে চলেন, তাহলে মেয়ের সেবা আপনিই বা কি করে করবেন—আমিই বা কি করে করবো, বুঝতে পারছি না। থান্ চা…

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি পেয়ালা তুলিয়া প্রবীর কহিল—নিন… ধরুন। প্রত্যাখ্যান করে অপমান নাই করলেন…

আশ্চর্য্য মানুষ! অগত্যা নীলিমা নিরুপায়ে চায়ের পেয়ালা হাতে লইল।

প্রবীর কহিল—আমার সামনে খেতে যদি লজ্জা হয়, বেশ, আপনি ঘরে বসে খান। পেয়ালা নিয়ে আমি বাইরে ঐ বারান্দায় যাচ্ছি…

অপর পেয়ালা লইয়া প্রবীর ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল…

নীলিমা কহিল,—না, আপনি যাবেন না…

ফিরিয়া প্রবীর কহিল—তাহলে আমার সামনে চায়ের পেয়ালা মুখে দিতে আপনার লজ্জা হবে না? সত্যি, বাঁচালেন! চা খেতে খেতে রাণুর সম্বন্ধে দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।...তা আপনি পেয়ালা ধরে রইলেন কেন? খান্ চা...

নীলিমাকে খাইতে হইল। প্রবীর কহিল,—এই তো বেশ...দেখুন দিকিন্···That's just like a good girl.

নবম পরিচ্ছেদ

অন্তরাল

তারপর দশ-বারো দিন রাণুর ছোট্ট প্রাণটুকুকে লইয়া যমে-মানুষে যে দারুণ যুদ্ধ চলিল, সে যুদ্ধে নীলিমা এবং প্রবীরের মাঝখানে আর এতটুকু অন্তরাল রহিল না! একেবারে পাশাপাশি গায়ে-গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া দুজনে এক হইয়া মরণের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। চিরকালের সঞ্চিত লজ্জা ও সংস্কারের গণ্ডী এ-যুদ্ধে কোথায় মুছিয়া গেল, তার কোনো চিহ্ন রহিল না! দুজনের পায়ের তলা হইতে সারা পৃথিবী যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে—আছে শুধু রাণু!

আঠারো দিনের দিন রাণুর জ্বর নামিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—আজ যদি জ্বর না বাড়ে, তাহলে এ যাত্রা ওকে ফিরে পাবো বলে' আশা দিতে পারি।

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টিতে নীলিমা প্রবীরের পানে চাহিল।

মৃদু হাস্যে প্রবীর কহিল—আর কোনো ভয় নেই...

কোনো মতে নীলিমা কহিল—সত্যি?

এ প্রশ্নের অন্তরালে প্রাণের কি অসহ্য অধীরতা···কতখানি সংশয়-দ্বিধা, প্রবীর তাহা বুঝিল। বুঝিয়া কহিল— স্তোক-বাক্য নয়··· বিশ্বাস করুন আপনি। আমি বরাবর জানি, রাণু সেরে উঠবে, কোনো বিপদ ঘটবে না।

তেমনি উদাস করুণ দৃষ্টিতে নীলিমা চাহিয়া রহিল প্রবীরের পানে... ও দৃষ্টির অসহায়তায় প্রবীরের মন গলিয়া যায়! জগৎ-সংসার, সমাজ-সংস্কার সব ভুলিয়া তার মনে হয়, একান্ত-আশ্রিতা নীলিমাকে ছোট বোনটির মতো বুকের উপরে টানিয়া লয়...টানিয়া আদরে মমতায় স্নেহে-সান্ত্বনায় তার এ দুঃখ-যাতনা মুছিয়া দেয়! ও চাহনি দেখিয়া প্রাণে এত মমতা জাগে...

প্রবীর কহিল—এবারে আপনি যান, মুখ-হাত ধুয়ে নিন...তারপর আপনি এসে রাণুর পাশে বসবেন, আমি যাব মুখ-হাত ধুতে···

*

দাসীর মতো নীলিমা প্রবীরের কথা মানিয়া চলে। প্রবীরকে না মানিয়া সে থাকিতে পারে না! এ-মানা যেন তার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে! কাজেই প্রবীরের কথায় সে কোনো প্রতিবাদ তুলিল না, নিঃশব্দে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

একজন বাঙালী নার্শ রাখা হইয়াছে। মোহিনী। হুগলির সিভিল-সার্জ্জন তাকে পাঠাইয়াছেন। মেয়েটি বড় ভালো। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর। পয়সার জন্য সেবা-পরিচর্য্যা করে,—ব্যবসা, তা বলিয়া স্নেহ-মম তাকে মন হইতে দূর করিয়া দেয় নাই।

মোহিনী আসিল।

প্রবীর বলিল,—ঘুমিয়েছিলে?

মোহিনী বলিল,—হ্যাঁ।

মোহিনীর পানে চাহিয়া প্রবীর কহিল,—তোমার চানটান হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তো!

মোহিনী বলিল—আপনারা আমাকে মোটে রাত জাগতে দেন না—অথচ আমার ডিউটি হলো রাত জাগা।

হাসিয়া প্রবীর কহিল,—তোমাকে বাইরের লোক বলে মনে করতে পারি না মোহিনী, তাই তিনজনে মিলে সব ডিউটি ভাগ করে নিয়েছি।

মোহিনী বলিল—আমিও এ-বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করি—আপনাদের গুণে।

প্রবীর কহিল—সকলেরই গুণ থাকা দরকার। না হলে একজনের বা দুজনের গুণে কোনো কাজে শৃঙ্খলা থাকে না! কিন্তু ও-কথা যাক্‌, এখন কি তুমি করতে চাও?

মোহিনী কহিল—রাণুকে ওষুধ-পথ্যি দেবো,—স্পঞ্জ করাবো।

প্রবীর কহিল—তুমি নিজে চা-টা খেয়েছো?

মোহিনী বলিল—আমি চা খাই না। আপনাদের এখানে আমার এই যে অভ্যাসটি ধরিয়ে দিলেন, এ ঘোড়া-রোগ গরীবের সইলে হয়!

প্রবীর কহিল—পরে ছেড়ে দিয়ো। এখন দরকার বলেই তোমাকে

খেতে বলি। চায়ের একটা গুণ আমি স্বীকা—প্রত্যক্ষ-ফল পেয়ে। সে গুণ, খাশা stimulant। সকালে এক-পেয়ালা চা খেলে জড়তা কাটে, কাজে-কর্ম্মে মন চাঙ্গা হয়। জানিনা, পরে কোনো কুফল ফলবে কি না!

মোহিনী বলিল—চা না খেয়েও সকালে আমার কোনো আলস্য ধরেনি কোনো দিন।

প্রবীর কহিল—তাতে কি! আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, অধিকন্তু না দোষায়! কি বলো···

কথার শেষে প্রবীর হাসিল।

রাণুর পানে চাহিয়া মোহিনী বলিল—চেহারার শ্রী ফিরেছে··· দেখছেন তো শুক্‌নো ভাব। এটা সুলক্ষণ!

প্রবীর কহিল—যে-যুদ্ধ গেছে, শুকোবে না? প্রাণপণে বেচারী যুদ্ধ করেছে রোগের সঙ্গে...তোমাকে পেয়েছিলুম, সে আমাদের মস্ত সৌভাগ্য!

মোহিনী বলিল—সব নার্শই সমান। আমার বিশেষ এমন কোনো দাম নেই···

প্রবীর কহিল,—আছে বৈ কি! তোমার যে মমতা দেখেছি, তারি দাম লক্ষ টাকা!

মোহিনী বলিল,—আপনি এখন উঠুন···উঠে মুখ ত ধুতে যান্।

প্রবীর কহিল—যাই...রাণু ঘুমোচ্ছে? না, কাহিলের দরুণ আচ্ছন্ন রয়েছে?

মোহিনী বলিল,—এটা ঘুম...অসুখের গ্লানি কেটে গেছে···আরাম

পেয়ে ঘুমোচ্ছে! এখন যদি এ-ভাবটুকু বজায় থাকে, তাহলে মেয়ে সেরে উঠলো, জানবেন।

প্রবীর কহিল—তাই হোক! মায়ের এই একরত্তি সম্বল...এত বড় পৃথিবীতে ও-বেচারীর আর কেউ নেই, কিছু নেই...

নীলিমা ফিরিল। প্রবীর কহিল—ভারী চট্‌পট্‌ সব সেরে নেছেন তো!

নীলিমা কহিল—আপনি যান...

—যাই।...

মুখ-হাত ধুইয়া ফিরিয়া প্রবীর কহিল—রাণু আজ ভালো আছে। এখানে কদিনে আমার কাছে একরাশ চিঠি এসেছে। একবার বাড়ী যাবো। ভাবছি, এখনি যাই—রাণু ভালো আছে তো···

মোহিনী বলিল—স্বচ্ছন্দে আপনি যেতে পারেন।

নীলিমার মুখ বিবর্ণ হইল। মুখে কথা নাই...অবিচল দুটি চোখের দৃষ্টি প্রবীরের মুখে স্থির নিবদ্ধ।

প্রবীর কহিল,—আবার অমন অসহায় কাতর চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন! ভালো না বুঝলে আমি যাবো কেন? এ ক'দিন তো যাইনি, যেতে চাইনি!...ছি, ভাববেন না। কতক্ষণ বা! বড়-জোর এক ঘণ্টার জন্য!...কেমন, একটু ঘুরে আসি?

মাথা নাড়িয়া নীলিমা সম্মতি জানাইলেও তার মনের মধ্যে যেন বাণ ডাকিয়া গেল···

বাড়ীতে শিবচরণ বাবু বসিয়া আছেন। শিবচরণ বাবু বাপের অফিসের ম্যানেজার। কলিকাতায় থাকেন অফিসের কাজকর্ম্ম চলে তাঁহারি বুদ্ধিতে।

শিবচরণ বাবু কহিলেন—ক'দিন একটিবার আসতে পারোনি বাবা, সেজন্য ভারী মুস্কিলে পড়েছি···

প্রবীর কহিল,—আসবার উপায় ছিল না কাকাবাবু। ও-বাড়ীতে ভারী অসুখ···দেখবার-শোনবার কেউ নেই! আজ ভালো আছে দেখে তবে আসতে পেরেছি।

শিবচরণ বাবু বলিলেন—আমিও এখান থেকে ব্যবস্থা না করে নড়তে পারছি না।···আজ একবার অফিসে না বেরুলে নয়। নতুন কতকগুলো কাজের কনট্রাক্‌ট্ এসেছে···দেখে-শুনে তোমাকে কাগজ-পত্র সই করতে হবে···না হলে মান রাখা যাবে না।

প্রবীর কহিল—যেতেই হবে? এখান থেকে সই করা চলবে না?

শিবচরণ বাবু বলিলেন,—না। এটর্নির স… কথাবার্ত্তা কওয়া আছে। তাদের লোক আসবে···

প্রবীর কহিল—এটর্নির সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমার চে… আপনিই তো ভালো করে' কইতে পারবেন কাকাবাবু। আপনার … কারবারের মঙ্গল আমি বেশী বুঝবো না, এ-কথা তো আপনি জানে…

শিবচরণ কহিলেন,—না বাবা, তা হয় না। আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো চিরদিন—কিন্তু তোমাকে চোখে দেখে সব করতে হবে। আমার উপর যত বিশ্বাসই তোমার থাকুক, কারবারী লোকের পক্ষে কাকেও কোথাও এতখানি প্রশ্রয় দিতে নেই—তাতে অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়।

আমি চাই, সব কাজ তুমি নিজের চোখে নিজে থেকে দেখে নেবে।

প্রবীর চিন্তিত হইল। ওদিকে রাণু—অথচ এদিকে কারবারের কাজ! কোনোটাই অবহেলা করিবার নয়!

শিবচরণ বলিলেন—বেলা বারোটার সময় তুমি বেরিয়ো। মোটরে যেতে কতই বা সময় লাগবে? আমি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি—ও-পক্ষের লোকেদের নিয়ে এটর্নির অফিসে অপেক্ষা করবো। তুমি সব কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে।

প্রবীর কহিল—তাই হবে। বেশ, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

এই কথা বলিয়া প্রবীর গেল স্নান করিতে। একরাশ চিঠিপত্র জমিয়া আছে—সেগুলার জবাব লেখা দরকার। কতকগুলি চিঠি কারবার সম্বন্ধে। ভাবিল, শিবচরণ বাবু এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা চলিবে।

স্নানের পর এদিককার কাজ চুকাইতে আরো একঘণ্টা সময় লাগিল। তারপর প্রবীর বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সুনীতি আসিয়া উপস্থিত।

সুনীতি বলিল—দাশু ঠিক খপর দেছে তো···

প্রবীর কহিল—কিসের খপর?

সুনীতি বলিল—সে কোথায় গিয়েছিল; এখন বাড়ী ফিরলো। ফিরে বললে, ও-বাড়ীর দাদাবাবু বাড়ী এসেছেন··

প্রবীর কহিল—তারপর?

সুনীতি বলিল—ক'দিন আপনার দেখা নেই—মা দারুণ ব্যস্ত।

খপর নেবার জন্য দাশুকে পাঠিয়েছিলেন। দাশু গিয়ে বললে, তারাশঙ্কর বাবুর মেয়েটির খুব বেশী অসুখ, তিনি সেইখানে আছেন! ও-বাড়ীতে মা দাশুকে পাঠাতো রোজ। দীনেশবাবুর কাছ থেকে দাশু খপর জেনে আসতো।···তারপর মেয়েটি এখন কেমন আছে?

প্রবীর কহিল—আজ একটু ভালো আছে।

সুনীতি আরামের নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আর ভয় নেই?

—তা কি বলা যায়!

সুনীতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল প্রবীরের পানে···সে দৃষ্টি দেখিয়া প্রবীর বুঝিল, সুনীতির আরো কি কথা আছে···

সে বলিল—কোনো বিশেষ কথা আছে?

সুনীতি কহিল—ছিল। তবে···

প্রবীর হাসিল, হাসিয়া বলিল,—ভূমিকা না করে বলে ফ্যালো···

সুনীতি বলিল—আজ মার জন্মদিন। ভেবেছিলুম, একটু উৎসব করবো। কিন্তু গোলমাল নয়···খুব চুপি-চুপি! রাত্তিরে আপনি আমাদের ওখানে যেতে পারবেন আজ?···বেশীক্ষণ থাকতে হবে না···শুধু একবার আসা। যেমন আসবেন, অমনি খেতে পাবেন—খেয়েই চলে আসবেন।···

প্রবীর জবাব দিল না, সুনীতির পানে চাহিয়া রহিল। দু'চোখে কৌতুকের আভাস!

সুনীতির মনে দ্বিধা-সংশয়ের একটু কালো মেঘ! বলিল—মানে, মার মনে খুব আহ্লাদ হতো। তা ও-বাড়ীতে অমন অসুখ···

প্রবীর কহিল—মাভৈঃ! আসবো নীতি। মাসিমাকে গিয়ে বলো, তাঁর জন্মদিন···আজ যখন জানতে পেরেছি, তখন নিশ্চয় আসবো!

খুশীতে সুনীতির মন ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—এখন যাচ্ছেন বুঝি ও-বাড়ীতে?

—হ্যাঁ।

সুনীতির মনে একটা বাসনা···সে-বাসনা সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কহিল—আমি যাবো আপনার সঙ্গে ও-বাড়ীতে?··· এককালে যেতুম···

প্রবীর কহিল—থাক্! কেন না, অসুখটা ভালো নয়। টাইফয়েড! ভয় হয়, যদি infection লাগে!

সুনীতির অভিমান হইল। সুনীতি কহিল—সে ভয় বুঝি আপনার নেই?

প্রবীর কহিল—মাখামাখি করছি, তাই আমরা সকলে immune··· কিন্তু তুমি যাবে একেবারে সোঁদা···তার চেয়ে তুমি বাড়ী যাও। গিয়ে মাসিমাকে আমার প্রণাম দিয়ে বলো, রাত্রে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসবো।

দশম পরিচ্ছেদ

সহায়

সারা-দিনটা প্রবীরের কলিকাতায় কাটিল। কাজ-কারবারের ব্যাপার, তার উপর এটর্নি-অফিসের পাঁচরকম মারপ্যাঁচ! এ শৃঙ্খল হইতে চট্ করিয়া মুক্তি মেলে না!

মনটা অস্থির রহিল,—অসুখ-বিসুখের উদ্বেগ! তবু সে উদ্বেগ বহিয়াও এ কটা দিন কি করিয়া কাটিয়াছে! আজ সে-বাড়ী হইতে দূরে আসিয়া প্রবীর বুঝিল অত-উদ্বেগের মধ্যেও আরামের অন্ত ছিল না। রোগশয্যায় রোগীর সেবায় যদি এমন আরাম পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগে কোনো ভয় থাকে না!

ফিরিবার জন্য মন উতলা হইল। সে বলিল—আমাকে দরকার নেই তো আর?

বৃদ্ধ এটর্নি বলিলেন,—এই যে আর-একটু···দলিলখানা দেখে যাও...

শিবচরণ বলিলেন—নাহলে আবার একদিন যদি আসতে হয়?

অগত্যা এটর্নির অফিসে বসিয়া বসিয়া বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল।

দলিলে সহি দিয়া শিবচরণের সঙ্গে প্রবীর আসিল পথে, বলিল—

আমাকে হয়তো আরও দু'চার দিন অফিস কামাই করতে হবে কাকাবাবু। মেয়েটি আর একটু না সারলে···মানে, যখন ভার নিয়ে বসেছি···

কথাটা শেষ হইল না; বাধিয়া গেল···

শিবচরণ বলিলেন,—বেশ তো···তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। তেমন দরকার হলে খপর দেবো।

দু'জনে মোটরে বসিল। শিবচরণকে অফিসে নামাইয়া প্রবীর গেল নিউ-মার্কেটে। রাণুর জন্য দু'চারিটা খেলনা কিনিল, পুতুল কিনিল।

পুতুল কিনিয়া বাহির হইবে, গুজরাটী-শাড়ীর দোকানে শো-কেশে নজর পড়িল। কত রকমের নূতন শাড়ী···

বয়সের ধর্ম্মে শাড়ী দেখিতে লাগিল। খরিদদারের মনকে প্রলুব্ধ করিতে দোকানদার মমি-পুতুলকে শাড়ী পরাইয়া শো-কেশে রাখিয়াছে। পুতুলের মুখ···প্রবীর চমকিয়া উঠিল···এ মুখ যেন নীলিমার মুখের ছাঁচে তৈয়ার করা! মুগ্ধ নয়নে প্রবীর পুতুল দেখিতে লাগিল। নিজের অজ্ঞাতে মনে হইল, এ-শাড়ীতে পুতুলকে এমন মানাইয়াছে! জীবন্ত-প্রতিমা নীলিমা যদি এ-শাড়ী পরিয়া সামনে দাঁড়ায়···

নিজের অজ্ঞাতে সে দোকানে ঢুকিল। দুদিক হইতে দু'জন লোক অভিবাদন করিল—Yes...

প্রবীর কহিল—ঐ শাড়ী দেখান্...

দোকানের লোক শাড়ী আনিয়া দেখাইল, একখানা নয়...বিশখানা, পঁচিশখানা শাড়ী...

সে শাড়ীর রাজ্যে প্রবীরের মনে ধাঁধা লাগিল···এত শাড়ীর মধ্যে বাছিয়া মনের মতো শাড়ী...

মন সহসা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, এ কি করিতেছিস্? নীলিমার হাতে শাড়ী দিবি কি বলিয়া? সে যদি বলে, শাড়ী কেন?...

নিজের চোখে ভালো লাগিল, তাই!...কিন্তু তোমার ভালো লাগার জন্ম নীলিমা এ শাড়ী কেন পরিবে? তুমি কে...

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, নীলিমা বাঙালীর ঘরের বিধবা...এ শাড়ী তাকে পরিতে নাই! কখনো তাকে এমন শাড়ী পরিতে দেখে নাই তো···

ভয়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মন একেবারে এতটুকু···

দোকানী এত শাড়ী বাহির করিয়াছে···কি বলিয়া প্রবীর এখন সরিয়া যায়?

মনকে কে চাবুক মারিল! বলিল—মাসিমার জন্মদিন···তাঁর কথা মনে পড়িল না বুঝি?···

ঠিক!

প্রবীর কহিল—এ শাড়ী এখন থাকুক। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে আর একদিন এসে দেখবো। আজ আমায় এমন একখানি শাড়ী দিন, মানে, গিন্নীবান্নী লোকের পরবার মতো···

দোকানী বলিল—অল্ রাইট্ স্যর!

আবার এক-প্রস্থ শাড়ী পড়িল টেবিলের উপর···তার মধ্যে হইতে ভালো একখানি শাড়ী বাছিয়া প্রবীর কহিল—এইটে পছন্দ দাম?

দোকানী বলিল—সাতাশ টাকা।

প্রবীর দাম দিল, দিয়া শাড়ী লইল। নীলিমার জন্ম শাড়ী বাছিতে গিয়া মনের মধ্যে এত কথা, এত চিন্তা ভিড় বাধাইয়া দিয়াছিল...সে ভিড় কোথায় তখন সরিয়া গিয়াছে! মন হাল্কা হইয়াছে!

প্রবীর আসিয়া খুশী-মনে গাড়ীতে বসিল, ড্রাইভারকে বলিল—বাড়ী চলো।

ড্রাইভার গাড়ী চালাইল ফরাশডাঙ্গার অভিমুখে…

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া প্রবীর নিজের মনকে লইয়া পড়িল…কথায় বার্ত্তায় মনের ভিতরকার রহস্যের সন্ধান…

মনের মধ্যে ঢুকিতে গিয়া প্রবীর দেখে, মনের দ্বারে বসিয়া আছে নীলিমা!

প্রবীর চমকিয়া উঠিল। অন্যায়! খুব অন্যায়! বিপদে পড়িয়া নিতান্ত আপনার জনের মতো প্রবীরকে কাছে ডাকিয়াছেন…প্রবীর নিজে বলিয়াছে, নীলিমা তার বোন· প্রবীর ভাই!

এই সম্পর্ক ধরিয়াই তার উপর নীলিমার অমন বিশ্বাস!…আর সে…

গ্লানি-ধিক্কারে ভরিয়া মন কালোয় কালো হইয়া গেল…

বাড়ী ফিরিয়া একদণ্ড বসিল না। তাড়াতাড়ি স্নান ও বেশভূষা সারিয়া প্রবীর ছুটিল রাণুদের বাড়ী।

রাণু ঘুমাইতেছে। মাথার কাছে বসিয়া নীলিমা মলিন-মুখী!…মোহিনী একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া রাণুর অসুখের চার্ট দেখিতেছে…

প্রবীরকে দেখিয়া নীলিমা বলিল—আপনি কী, বলুন তো? সারাদিনে দেখা নেই! রাণু সাতবার আপনার খোঁজ করেছে…

প্রবীর কহিল—ভালো আছে তো ?

নীলিমা কহিল—হ্যাঁ।

প্রবীর চাহিল মোহিনীর পানে ; কহিল,—কেমন টেম্পারেচার আজ ?

মোহিনী বলিল—ভালো আছে।

কথাটা বলিয়া চার্ট আনিয়া সে প্রবীরের হাতে দিল।

প্রবীর দেখিল…দেখিয়া নীলিমার পানে চাহিল। নীলিমা তাহারি পানে চাহিয়াছিল। দু'চোখের দৃষ্টিতে কতখানি নির্ভর…কতখানি আরাম…প্রবীর বুঝিল।

মোহিনী বলিল—মেয়ে আজ কত গল্প করেছে…শুধু আপনার কথা !

নীলিমা কহিল,—তাই…

কথাটা নীলিমা বলিল প্রবীরের পানে চাহিয়া। বলিয়া হাসিল, হাসিয়া তখনি আবার বলিল—ভালো। আমাকে ছাড়া আর-কাকেও জানতো না। ভয় হতো…ভাবতুম, যদি আমি মরে যাই…মেয়েটা কি করে বাঁচবে !

প্রবীর কহিল—একটা বড় ভুল হয়ে গেছে…মাপ করবেন।

থমকিয়া নীলিমা বলিল—কি ?

প্রবীর বলিল—আসবার সময় একখানি গীতা আর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ আনবো ভেবেছিলুম…ভুলে গেছি…

নীলিমা বলিল—কেন ? সে-বই কি হবে ?

প্রবীর কহিল—আপনি পড়বেন…

নীলিমা তবু এ-কথার অর্থ বুঝিল না…ডাগর দুই চোখের দৃষ্টিতে একরাশ কৌতূহল লইয়া প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রবীর বলিল—পড়া উচিত। এ-বয়সে মৃত্যুর কথা যিনি চিন্তা করতে শিখেছেন, তিনি তো ইহকালের সমুদ্রটুকু সাঁতরে পার হয়ে পড়েছেন... কাজেই তাঁর ও-পারের সংস্থান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা দরকার!

নীলিমা বুঝিল, বুঝিয়া সস্মিত ভাবে বলিল—আপনার শুধু তামাসা!

প্রবীর কহিল—তামাসা নয়...এ বড় সত্য কথা। জীবনে এর আগে কখনো আর এমন সত্য তত্ত্ব-কথা আমি বলিনি!...যাক, কতকগুলো খেলনা এনেছি...সেগুলা দয়া করে যদি রেখে দেন।

মোহিনী বলিল—উনি মেয়ের বিছানায় বসে আছেন...নাই-বা হাত দিলেন! আপনি ও-ঘরে রেখে দিন।

প্রবীর কহিল—বেশ...কিন্তু একবার দেখুন...

প্রবীরের কাছে ছিল দুটা প্যাকেট...একটিতে পুতুল আর খেলনা; অপরটিতে হেমপ্রভা দেবীর জন্য কেনা সেই সিল্কের শাড়ী। প্যাকেট দুটা প্রবীর রাখিয়া ছিল কোণে টেবিলের উপর।

পুতুলের প্যাকেট খুলিয়া পুতুল দেখিয়া নীলিমা বলিল—ঐ প্লাশের খরগোশটা ভারী পছন্দ করবে। কত-বড় খরগোশ···ঠিক যেন সত্যিকারের!

প্রবীর কহিল—দোকানে ঐ একটিই ছিল...

মোহিনীর হাতে পুতুল ও খেলনা দিয়া প্রবীর বলিল—দয়া করে আপনি এগুলো রেখে দিন...

পুতুল লইয়া মোহিনী গেল পাশের ঘরে···

নীলিমা নিশ্বাস ফেলিল। কহিল,—আপনার দয়া কখনো ভুলবো না! আপনি এত ভালো...

কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল...কথা বাধিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে জলের ধারা উথলিয়া উঠিল...

প্রবীর তাহা দেখিল। দেখিয়া কহিল—এ কি, কাঁদছেন! ছি...

সে অশ্রুর উপর মলিন-হাসির তুলি বুলাইয়া নীলিমা কহিল—দুঃখের জন্য নয়...এ-মন যেন ভরে উঠেছে...কি যেন মনে হচ্ছে...বলতে পারছি না...বুঝতে পারছি না...

অশ্রুর ঝর্ণার উপরে মৃদু-হাসির কিরণ ফুটিল—যেন একসঙ্গে মেঘ রৌদ্রের খেলা! প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস নীলিমার বুক ঠেলিয়া বাহির হইল।

ও-নিশ্বাসের সঙ্গে কতদিনকার সঞ্চিত নৈরাশ্য-বেদনা যে বাহির হইয়া গেল...

প্রবীর বলিল—আমার সামনে এরকম করে নিশ্বাস ফেলবেন না। আমার নিজের জীবন ওমনি নিশ্বাসে ভরে আছে...তাই কারো নিশ্বাস আমি সইতে পারি না।...

নীলিমা ব্যথা বোধ করিল। অসহায়ের মতো করুণ কণ্ঠে বলিল,—ইচ্ছা করে নিশ্বাস ফেলিনি আমি...আপনি পড়ে। কি করবো?

প্রবীর কহিল—যাতে না পড়ে, চেষ্টা করবেন...

নীলিমা কোনো কথা বলিল না...প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল... নীলিমার দু'চোখ সঞ্চিত-সলিল-ভারে ঝকঝক্ করিতে...

মোহিনী ফিরিল, ফিরিয়া বলিল—ও-ঘরের টেবিলে রেখে এলুম।... ওটা কিসের প্যাকেট প্রবীর বাবু?

প্রবীর কহিল—ও...হ্যাঁ,...দেখুন তো, মাসিমার আজ জন্মদিন...

এই শাড়ীখানি তাঁর পায়ের কাছে রেখে তাঁকে প্রণাম করবো... কাপড়খানা খারাপ হবে না তো?

প্যাকেট খুলিয়া শাড়ীখানি সে মেলিয়া ধরিল...

মোহিনী বলিল—পরের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন...দেখবেন, infection না যায়! সাবধান হওয়া উচিত।

নীলিমা বলিল—নিশ্চয়!...আপনি ও-শাড়ী হাতে রাখুন···আমাদের হাতে দেবেন না তাহলে···

শাড়ী দেখিয়া দুজনেই সুখ্যাতি করিল···

প্রবীর চাহিল মোহিনীর দিকে, কহিল—মোহিনী দিদিকে আর একবার কষ্ট দেবো...

মোহিনীকে এখন 'দিদি বলিয়া ডাকে। একসঙ্গে ক'দিনের সেবা-পরিচর্য্যায় তিনজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা নিবিড় হইয়াছে...

মোহিনী বলিল,—বলুন, কি করতে হবে।

প্রবীর কহিল,—এ-শাড়ীখানিও ও-ঘরে রেখে আসুন।

হাসিয়া মোহিনী কহিল—এর জন্য এত ভূমিকা করছিলেন!···দিন শাড়ী...

প্রবীর শাড়ী দিল, মোহিনী শাড়ী লইয়া কহিল—অমনি একটু কাজ সেরে আসি।···

মোহিনী শাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

বেতের একটা মোড়া টানিয়া প্রবীর তার উপরে বসিল, বলিল—তারপর...বলুন সারাদিনের রিপোর্ট...

নীলিমা কি ভাবিতেছিল, প্রবীরের কথায় তার পানে চোখ তুলিয়া

চাহিল। চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কোচের সঙ্গে অনেকখানি মিনতিও যেন মাখানো রহিয়াছে।

প্রবীর কহিল—কি, অমন চুপ করে চেয়ে রইলেন যে?

নীলিমা কহিল—আজ রাত্রে আপনি তাহলে এখানে থাকবেন না?

প্রবীর কহিল,—তার মানে?

—ওঁদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে...

নীলিমার দু'চোখের সে-মিনতি দেখিয়া প্রবীর আরাম বোধ করিল... তার উপর এতখানি নির্ভর···মনে কৌতূহল আরো দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

প্রবীর কহিল—হ্যাঁ, আছে।

নীলিমা কহিল—খাওয়া-দাওয়ায় গল্পে-স্বল্পে রাত্তির হবে...ওখান থেকে বাড়ী যাবেন...নিশ্চয়?

প্রবীর কহিল—যদি বেশী রাত্তির হয়, এখানে এসে ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করে সকলকে বিব্রত করা কি উচিত হবে?

প্রশ্ন করিয়া মনের কৌতূহলকে সে-প্রশ্নের পিছনে প্রবীর অধীর সমুদ্যত রাখিল।

মৃদুকণ্ঠে নীলিমা কহিল—কিন্তু আমরা এই দুটি মাত্র মেয়ে-মানুষ ...আবার যদি অসুখ হয়? বড্ড ভয় করবে···

হাসিয়া প্রবীর কহিল,—না, ভয়ের আর কিছু নেই···ওর চেহারা দেখছেন না? দেহ যেন পাত হয়ে গেছে। রোগের সময় রোগীর দেহ যতক্ষণ ভালো থাকে, ততক্ষণ জানবেন, রোগের জড় যায়নি...কিন্তু দেহ একবার পাত হয়ে গেলে বুঝবেন, রোগের জড় কেটে গেছে।

নীলিমা কোন কথা বলিল না…চুপ করিয়া দু'চোখের শান্ত দৃষ্টি প্রবীরের মুখে নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল…

প্রবীরের মন মমতায় ভরিয়া গেল…সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সে-প্রশ্ন আবার সমুদ্যত…

প্রবীর কহিল—আমার কথার আপনি জবাব দেন নি কিন্তু…

নীলিমা কহিল—কি কথার জবাব ?

প্রবীর কহিল—ঐ যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অত রাত্রে হাঁকাহাকি ডাকাডাকি করে সকলের ঘুম ভাঙ্গানো কি উচিত হবে ? মানে, ও-খানে যদি বেশী রাত হয় ?

নীলিমা কহিল—ডাকাডাকি করতে হবে না আপনাকে…

প্রবীর কোনো জবাব দিল না।

নীলিমা কহিল—যত রাতই হোক, আমি ঘুমোবো না…রাস্তার দিকে কাণ পেতে থাকবো। আপনি এসে দরজায় ধাক্কা দেবেন শুধু…আমি গিয়ে দরজা খুলে দেবো…

প্রবীরের মনের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল…সে-মন আবার স্থির হইবার পূর্ব্বে প্রবীর শুনিল নীলিমা বলিতেছে,—আপনি না এলে সারা রাত ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবো…না বলতে, আপনা থেকে এত কষ্ট যখন করলেন, যতদিন রাণু পথ্য না পায়, দয়া করে আরো খানিক কষ্ট সহ্য করুন। নাহলে…

কথা শেষ হইল না…বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভরিয়া বাধিয়া গেল।

প্রবীর কহিল—এর জন্য এত মিনতি করছেন কেন ? নিজের বাড়ীতে না থেকে এখানে থাকবো…এতে কষ্ট কোন্ জায়গায় হবে, বুঝতে পাচ্ছি না…

প্রবীর হাসিল। নীলিমাও হাসিল···

বর্ষাম্লান বহু দিবসের পরে রৌদ্র উঠিলে সে-রৌদ্র যেমন দেখায়, নীলিমার এ-হাসি ঠিক তাহারি মতো...

সে হাসি প্রবীরের মনে আরামের বন্যা বহিয়া আনিল। এমন আরাম জীবনে সে পূর্ব্বে আর কখনো বোধ করে নাই···

মোহিনী আসিয়া বলিল—আপনার চা···

তার হাতে চায়ের ট্রে···

প্রবীর কহিল—ঐটে আজ মাপ করতে হবে। এখনি যাবো নেমন্তন্ন খেতে। এখন চা চলবে না। তার চেয়ে ফিরে এসে দেখা যাবে'খন···

মোহিনী বলিল—বাঃ, আমি যে তৈরী করে আনলুম...

হাসিয়া প্রবীর কহিল—আর একবার তৈরী করবেন। যখন রমণী-জন্ম নেছেন, তখন এ-কষ্টভোগ করবেন by birth-right···নয় ?

একাদশ পরিচ্ছেদ

জীবন-তরঙ্গ

রাত নটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রবীর আসিয়া ডাকিল—মাসিমা...

সুনীতি ছিল দোতলার ঘরে জানলার ধারে দাঁড়াইয়া; প্রবীরকে ফটকে ঢুকিতে দেখিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল, কহিল—আসুন...

প্রবীর কহিল—বড্ড রাত হয়ে গেছে...

সুনীতি কহিল—মা বলছিলেন, বোধ হয় আসবেন না! আমি কিন্তু জানতুম, নিশ্চয় আসবেন!

প্রবীর কহিল—আমার জন্যে আর সকলে বসে আছেন...ভারী অন্যায় হয়েছে।

সুনীতি কহিল—আর সকলে মানে?

প্রবীর কহিল—আরো অনেকে এসেছেন তো?

হাসিয়া সুনীতি কহিল—না। মা আর কাকেও বলতে দিলেন না! বললেন, তাঁর জন্মদিন...বললেন, বলতে যদি হয় শুধু আপনাকে বলতে পারি...

প্রবীর কহিল—ও…তাহলে তো অন্যায় আরো বেশী হয়েছে! চলো …এখানে দাঁড় করিয়ে রাখচো কেন? আরো দেরী হচ্ছে।

সুনীতি কহিল—বা রে, আমি বুঝি দাঁড় করিয়ে রেখেছি? আপনিই তো দাঁড়ালেন…

প্রবীর কহিল—তুমি গতিরোধ করে সামনে থাকলে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে পারিনা তো…

সুনীতি খুব কৌতুক বোধ করিল। কহিল,—আসুন। না হয় আগে আগেই চলুন…শেষে আবার অপবাদ দেবেন!

প্রবীর কহিল—ন জনস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ! আমি কেন আগে আগে যাবো? শাস্ত্রে নিষেধ রয়েছে।

সুনীতি কহিল—ও-শাস্ত্র হলো প্রাচীন। এখনকার শাস্ত্রে বলে—আগে চল্ আগে চল্ ভাই…

প্রবীর কহিল—তোমার সঙ্গে বাকযুদ্ধে আমি পরাজয় মানছি। বেশ, আধুনিক শাস্ত্র মেনে আমি আগে-আগে যাবো…গিয়ে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করবো।…কিন্তু কোথায় যাবো? দোতলায়? না, একতলায় রান্নাঘরের দিকে?

সুনীতি কহিল—মা রান্নাঘরে। নিজের হাতে খাবার তৈরী করছেন। বামুনদিকে ছুটী দেছেন…

প্রবীর কহিল,—বটে……

অন্দরে-আসিয়া প্রবীর ডাকিল,—মাসিমা…

রান্নাঘর হইতে মাসিমা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ওপরে গিয়ে বসো। নীতি নিয়ে যাও…

পাষাণ

প্রবীর কহিল—না মাসিমা, পাকশালা না দেখে ওপরে যাবো না...

বলিতে বলিতে সে আসিল একেবারে রান্নাঘরের দ্বারে, কহিল,—এ কি কাণ্ড মাসিমা! সত্ত জন্মেছেন...জন্মেই এত রকমারি খাবার খাবার লোভ! আপনার মা কাছে থাকলে ভয়ঙ্কর বকুনি খেতেন—এ-সবের কিছুই তিনি আপনাকে খেতে দিতেন না!

হেমপ্রভা এ পরিহাসে খুশী হইলেন, কহিলেন—তোমরা নতুন বাপ-মা। না খেলে তোমরা যে ছাড়বে না, বাবা। তা, এখানে নয়, বাবা...আমার আর দেরী নেই...বড় জোর আধ ঘণ্টা। ওপরে গিয়ে বসো ...লক্ষ্মীটি!

প্রবীর কহিল—তাড়ালেন, বেশ...চললুম। কিন্তু আজ আপনার রান্নাঘরে থাকবার কথা নয়। আপনাকে নিয়েই তো আজ আনন্দ করবো, গল্প করবো, মাসিমা।

হেমপ্রভা বলিলেন,—এই যে বাবা, এখনি যাচ্ছি। কত গল্প করতে চাও, করো তখন।

সুনীতির সঙ্গে প্রবীর আসিল দোতলার ঘরে।

ঘর সজ্জিত। ফুলের মালা, ফুলদানীতে ফুল—ফুল দিয়া যতখানি ঘরের সজ্জা করা চলে, সুনীতি করিয়াছে।

প্রবীর কহিল—এ ঘর কে সাজিয়েছে? তুমি?

সুনীতি কহিল—হ্যাঁ। কেমন হয়েছে?

—ভালো!...এত রকমের ফুল...এ তো এখানে মেলে না। নিশ্চয় কলকাতা থেকে আনিয়েছো!

সুনীতি কহিল,—হ্যাঁ, ও বাড়ীর বিশুদা কল্‌কাতা কর্পোরেশনে চাকরি করে...নিউ মার্কেটের পাশে। বিশুদাকে দিয়ে আনিয়েছি।

প্রবীর কহিল—বেশ করেছো...আচ্ছা, এখন একটা কথার জবাব দাও দিকিনি···

—বলুন···

—তুমি আজ ওঁকে কি উপহার দিচ্ছ ?

সুনীতি কহিল—আমি তো ঘরে বন্দী হয়ে আছি···কোথা থেকে কি আনবো ? পরের উপর নির্ভর...বিশুদাকে দিয়ে আনিয়েছি একখানা জরি কল্কাদার দেশী শাড়ী আর সেণ্ট-সাবান...

প্রবীর কহিল—আমার একটি উপকার করবে ?

—বলুন...

—মানে, কথাটা কারো কাছে প্রকাশ করবে না, আগে বলো···

—না,...সত্যি কাকেও বলবো না। আমাকে সে বিশ্বাস করতে পারেন।

—তা জানি। বিশ্বাস করতে পারি বলেই বলছি···

—বলুন···

প্রবীর কহিল—আমি একখানি শাড়ী এনেছি। ত্যাখো তো, পছন্দ হবে তো ?

প্যাকেট খুলিয়া প্রবীর শাড়ী দেখাইল। দেখিয়া সুনীতি খুব পছন্দ করিল।

প্রবীর কহিল—এ শাড়ী আজ ওঁর পরা চাই···পরবেন তো ?

সুনীতি কহিল—আপনি বললে আপনার কথা মা নিশ্চয় রাখবেন।

প্রবীর কহিল—সেই কথা।...শাড়ীর সঙ্গে আর কি দিতে হয়, আমি জানি না। মানে, জ্ঞান হয়ে অবধি শাড়ীর চিহ্ন একরকম দেখিনি বললে

চলে! শুধু শাড়ী দেওয়া ভালো হবে না...সেই সঙ্গে ফুলের মালা, চন্দন, সাবান, সেণ্ট...এ-সব আনা উচিত ছিল।

সুনীতি কহিল—বেশ তো, আমার কাছে আছে সেণ্ট সাবান ফুল... নিন্ আপনি। তা ছাড়া সধবা মানুষকে সিঁদুর দিতে হয়। সে-ও আমি দেবো'খন।

প্রবীর কহিল—কিন্তু তোমার জিনিষ দেবো? তাতে আমার পুণ্য হবে না তো।

সুনীতি কহিল,—আমার জিনিষ আপনাকে আমি দিচ্ছি,...সে জিনিষ আপনার হবে তো। তখন দিলে দোষ হবে কেন?

প্রবীর কহিল—কিন্তু তোমার জিনিষ আমি অমনি অমনি নিতে যাবো কেন? আমার তো জন্মদিন নয় আজ···তা নেবো না। তুমি যদি এ-সব জিনিষের মূল্য নাও, তাহলে নিতে পারি।

সুনীতি এ-কথার জবাব দিল না..,তার মুখ মলিন হইল।

প্রবীর কহিল—চুপ করে রইলে যে?

সুনীতি কহিল—আমি তো দোকানদার নই। এ সবের ব্যবসা করি না যে মূল্য নেবো!

প্রবীর হাসিল, হাসিয়া কহিল—বাঃ, আমি কি তাই বলছি! ত্যাখোনি, পূজা-কার্য্যে পুরুতকে মূল্য ধরে দিতে হয় অনেক জিনিষের। দেখেছিলুম একবার। কি এক শান্তি-স্বস্ত্যয়নে ঘোড়া দান করবার কথা ছিল। তা ঘোড়ার দাম তো সহজ নয়—সেক্ষেত্রে পুরুতকে ঘোড়ার মূল্য দিয়েছিল পাঁচ সিকে।...তোমার যে-জিনিষ আমি নেবো, ধরো তার দাম যদি হয় দশ টাকা...তুমি ভাবো, আমি তোমায় দশ টাকা মূল্য

দেবো? রামচন্দ্র! স্বপ্নেও তা ভেবো না...এমনি কিছু মূল্য ধরে দেবো...

সুনীতি এবার কৌতুক বোধ করিল। কহিল—কি মূল্য দেবেন, শুনি?

প্রবীর কহিল—তোমাকে যদি ছোটখাট কোনো জিনিষ এনে দি?...ধরো, মাথার তেল, কি কোন নতুন সেণ্ট?

সুনীতি কহিল—বেশ,...তাই দেবেন। যদি আপনার মনে খট্‌কা লেগে থাকে, বেশ! মাথার তেল, কিম্বা বেবি পুতুল, কিম্বা লাট্টু, নয় লাজেঞ্জেশ। ?

প্রবীর কহিল—ঠাট্টা হচ্ছে! লাজেঞ্জেশকে ঠাট্টা! আমি যদি এখনো এ বয়সে লজেঞ্জেশ খেতে পারি, তুমি আমার চেয়ে ছোট, তুমি দশ-বারো বচ্ছর এখনো লাজেঞ্জেশ পেলে আর কিছু তোমার চাওয়া উচিত হবে না!...যাক্, তাহলে তোমার সঙ্গে কনট্রাক্ট যখন পাকা হয়ে গেল, তখন এ শাড়ীখানি তুমি রাখো...শাড়ীর সঙ্গে আর যা-যা জিনিষ দিতে হয়, দিয়ে দিয়ো। তারপর কাল আমি সে-সবের মূল্য তোমায় ধরে দেবো। ...কেমন?

সুনীতি আলমারি খুলিয়া তার মধ্যে শাড়ী রাখিল। তারপর খুঁটিনাটি দু একটা ছোট কাজ সারিয়া প্রবীরের কাছে ফিরিল...

প্রবীর কহিল,—এখন?

সুনীতি কহিল—ও বাড়ীর খপর কি? এতক্ষণ তর্কে মত্ত ছিলুম, জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মেয়েটি কেমন আছে?

—ভালো। বোধ হয় এ যাত্রা সেরে উঠলো।...

সুনীতি কি ভাবিল, তারপর বলিল—মেয়ের মাকে কেমন দেখলেন ?

প্রবীর চমকিয়া উঠিল, কহিল,—মানে ?

সুনীতি কহিল—মানে, নিজেকে দেওয়ালের আড়ালে বন্দী রেখেছেন কি না…কি চমৎকার চেহারাই দেখেছি…যেমন রঙ, তেমনি গড়ন ! তাই জিজ্ঞাসা করছি, এখন তেমনি আছেন ?

প্রবীর কি ভাবিতেছিল, কহিল—শ্বেতপাথরের তৈরী পুতুল দেখেছো ? কোনো ওস্তাদ কারিগরের হাতের তৈরী ?

সুনীতি কোনো জবাব দিল না…

প্রবীর কহিল,—খুব ভালো পেণ্টারের আঁকা সুন্দরীর ছবি দেখেছো ?

সুনীতি কহিল,—দেখেছি…

প্রবীর কহিল—সেই রকম…অর্থাৎ দেখতে অপরূপ…কিন্তু ঐ পাথরের পুতুলের মতো ! জীবন্ত রূপসীর মতো নন্ যেন ! কথা কন্, চিন্তা করেন…যেন সে আর কে ! সত্যি, আমার সাধ হয় দেখতে, এ পাষাণে পুরোপুরি যদি কখনো আবার প্রাণ সঞ্চার হয়…

সুনীতি এক-মনে কথা শুনিতেছে…কোথা হইতে একটা নিশ্বাস বুকের অতল-তল হইতে তার অজ্ঞাতে উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল…

প্রবীরের চমক ভাঙ্গিল। উচ্ছ্বাস-ভরে এ সে কি বলিতেছে ? পরের গৃহে তাঁদের বিপদে যাইতে পারিয়াছে বলিয়া এভাবে কাব্যের মতো রূপ-বর্ণনা…

প্রবীর কহিল—ও-কথা যাক,…অনেকদিন তোমার গান শোনা হয়নি…

শুনতে কে বারণ করেছিল ?

এ-স্বরে অভিমানের একটু ছিটা !

প্রবীর বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিল না, কহিল,—আসতে পারিনি··· তা সঙ্গীত-সাধনা চলছে তো ?

—না···

সাশ্চর্য্য কণ্ঠে প্রবীর কহিল—না !···তার মানে ?

সুনীতি কহিল—একা-একা বুঝি মানুষের গান গাইতে ভালো লাগে...কেউ যদি সে গান না শোনে ?

প্রবীর কহিল—শ্রোতা সামনে হাজির...গাও···

সুনীতির লজ্জা করিতেছিল···

প্রবীর তার হাত ধরিল। কহিল,—বসো ঐ অর্গানের সামনে... বসে গাও...

সুনীতি আপত্তি করিল না; বসিল; হাসিয়া কহিল—কি গান গাইবো ? বা রে...

—যে-গান মনে আসে···

সুনীতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর গাহিল...

সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে
তারে আমার মালার একটি কুসুম দে !
যদি শুধায় কে দিল
কোন্ ফুলকাননে···

সুনীতি বেশ দরদ দিয়া গান গায়,—তার গলা ভালো। প্রবীরের ভালো লাগিল। এ ক'টা দিন কাটিয়াছে সেবার কাজে দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের

মধ্য দিয়া…মন যেন শ্রান্তি-অবসাদে ভরিয়া ছিল। সে শ্রান্তি-অবসাদের উপর এ গান…সারা মনে স্বপ্ন-তুলি বুলাইয়া দিল!

প্রবীর চক্ষু মুদিয়া গান শুনিতেছিল। মানস-নয়নের সামনে জাগিয়া ছিল, কুঞ্জ-কানন…সে-কাননে বসিয়া উদাসিনী নায়িকা…নায়িকার মাথায় কুসুম-হার…সে হার হইতে একটি কুসুম লইয়া সখীর হাতে দিতেছে—নিত্য যে আসিয়া ফিরিয়া যায়, তার জন্য…

গান থামিলে সুনীতি কহিল—বিশ্রী হলো খুব…না?

প্রবীরের স্বপ্ন-চমক ভাঙ্গিল। প্রবীর কহিল—তার মানে?

সুনীতি কহিল—আমার ভারী লজ্জা করছে…কি ছাই গাইলুম!

প্রবীর কহিল—চমৎকার গেয়েচো। তোমার আজকের গান আমার এত ভালো লেগেছে…

সুনীতির মুখে লজ্জার রক্তিম আভা…অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে সে প্রশংসা শুনিল।

প্রবীর কহিল—সত্যি, এত চমৎকার গেয়েছো যে তুমি বসে গান গাইছো, এ-কথা আমার মনে হয়নি…

সলজ্জ ভাবে সুনীতি কহিল—কি মনে হয়েছিল, শুনি?

প্রবীর কহিল—মনে হচ্ছিল, মনের মধ্যে চিরযুগ ধরে যে-নায়িকার বাস, সে যেন সুরের হাওয়ায় তার প্রাণের আকুলতা ভাসিয়ে দেছে! যেন…

কথা শেষ হইল না। হেমপ্রভা আসিলেন, কহিলেন,—গান হলো?

প্রবীর উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—হ্যাঁ মাসিমা…সুনীতি আজ চমৎকার গান গেয়েছে…খুব ভালো। এর জন্য ওর একটা প্রাইজ পাওয়া দরকার

...দেখো প্রাইজ এনে।...কিন্তু আপনার ও ডিপার্টমেণ্টের কাজ চুকলো তো?

হেমপ্রভা কহিলেন,—হ্যাঁ বাবা...এবার তোমাদের খেতে দিই... কেমন?

প্রবীর কহিল—কিন্তু তার আগে একটু কাজ আছে···

সাশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে হেমপ্রভা বলিলেন—এত রাত্রে আবার তোমার কি কাজ বাছা?

প্রবীর কহিল—আছে মাসিমা, আছে। জানেন তো, কর্ম্মবীর ছেলে আমি···আমার কাজ কি ফুরোয়?

এই কথা বলিয়া প্রবীর চাহিল সুনীতির পানে, চাহিয়া বলিল,—Attention...মনে আছে...এবার সেই...

সুনীতি হাসিল, বলিল,—ও...হ্যাঁ...

বলিয়া আলমারি খুলিয়া প্রবীরের কেনা শাড়ী বাহির করিল,—করিয়া প্রবীরের হাতে দিল।

শাড়ীখানি হেমপ্রভার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রবীর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, করিয়া কহিল—ছেলে বড় হয়েছে। আজকের দিনে আপনার পায়ের কাছে দাঁড়াবার সৌভাগ্য যখন হারাইনি, তখন... মানে, এ শাড়ীখানি আপনাকে পরতে হবে, মাসিমা. আমি আহ্লাদ করে এনেছি।

হেমপ্রভা বিস্ময়ে খুশীতে অভিভূত হইলেন। কহিলেন,—কিন্তু এ কি পাগলামি তোমার! কেন অনর্থক বাজে-খরচ করতে গেলে বলো তো!···না, এ তোমার অন্যায়।

প্রবীর কহিল,—আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, তাঁর জন্মদিনে আমি আজ ঠিক এমনি করেই তাঁর পায়ে আমার প্রণাম নিবেদন করতুম। মা নেই, মাসিমা আছেন...মাকে দিয়ে আমার যে সাধ পূর্ণ হয়নি, মাসিমার কাছে তা অপূর্ণ থাকবে?

এ কথায় হেমপ্রভার মন মমতায় ভরিয়া বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল। প্রবীরের চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে তিনি বলিলেন—না বাবা, তোমার এ সাধ অপূর্ণ থাকবে না! কিন্তু তোমার এ প্রণাম নেবার যোগ্যতা আমার কতখানি আছে, তাই ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠছি···

বিস্মিত কণ্ঠে প্রবীর কহিল—মা-মাসির অযোগ্যতা! আপনি আমাকে অবাক করলেন, মাসিমা। কথায় বলে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়! মা-মাসি কোনোদিন ছেলের কাছে অযোগ্য নন, অযোগ্য হতে পারেন না। যারা বলে, হয়, তাদের কথা আমি মানিনা। তারা মানুষ নয়, কাপুরুষ!

সেদিন হেমপ্রভা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতে পারিলেন না। মাতৃ-স্নেহের সুধার উচ্ছ্বাসে মন ভরিয়া রহিল। মনে হইতেছিল এ-স্নেহ দিয়া প্রবীরকে যদি চিরদিনের মতো আপন করিতে না পারি, তাহা হইলে এ স্নেহ মিথ্যা নিরর্থক হইবে! সুনীতিকে আর কারো হাতে দিবার কথা মনে উদয় হইবামাত্র মন বিরূপতায় ভরিয়া তীব্র যাতনায় হাহাকার করিয়া ওঠে!

অথচ বিপদে পড়িয়াছেন! এ অনাবিল স্নেহের উপরে প্রবীরকে

যদি মনের বাসনা প্রকাশ করিয়া বলেন! যদি বলেন, বাবা, সুনীতিকে আর কাহারো হাতে সঁপিয়া দিতে মন না—দয়া করিয়া তুমি যদি...

ভয় হয় পাছে প্রবীর ভাবে, এ স্নেহ-নির্ঝরের উৎস...ঐ স্বার্থের শিলা-প্রস্তরে তার স্থান! তা যে নয়, মায়ের প্রাণের সে পরিচয় প্রবীরকে কি করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন?

প্রবীরকে চাই, অথচ চাওয়ার কথা বলিতে বাধিতেছে! দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া তাঁর মন বদ্ধ-কারায় মাথা ঠুকিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল।...

এ অস্বস্তি বিরাম মানিতে চায় না!

এদিকে হেমপ্রভার মন যখন অস্বস্তি-ভারে ভারী হইয়া উঠিতেছিল, তখন ভাগ্য-বিধাতা ওদিকে প্রবীরের জীবন লইয়া নব-কৌতুক-রচনায় নিবৃত্ত রহিলেন না।

রাণু সারিয়া উঠিল। কিন্তু এমন হইয়াছে যে তার পানে চাহিলে ভয়ে-ভাবনায় মন হু-হু করিয়া ওঠে! যেন পাপড়ি-ভাঙ্গা শুষ্ক কলি! ভয় হয়, রৌদ্রের একটু প্রখর তাপ লাগিলে বুঝি ও পাপড়িগুলিকে আর ধরিয়া রাখা যাইবে না! ভাবনা হয়, এ শুষ্ক দল গুলি কি কখনো আর জীবনের রসে ভরিয়া উঠিবে!

নীলিমার ম্লান নয়নের দৃষ্টিতে আরো ম্লানিমা নামিল।

প্রবীর কহিল—দিন-রাত কি এত ভাবেন, বলুন তো?

নিশ্বাস ফেলিয়া নীলিমা বলিল—রাণুর জন্য আমার মনে একতিল

স্বস্তি নেই! দেখুন দিকিনি, ওর চেহারা যা হয়ে রইলো...যেন ঝড়ে ঝরা নির্জীব পাখী!

কথা সত্য। প্রবীর কহিল—আমার মনে হয়...

নীলিমা একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—কি মনে হয়, বলুন আমার কাছে স্পষ্ট করে'...রাণু কি আর তেমন হয়ে সেরে উঠবে না?

প্রবীর কহিল—আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এত বড় রোগ থেকে উঠলো···আগেকার মতো হতে অনেকখানি সময় লাগবে...

নীলিমা নিশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না, কহিল—আমার বড্ড ভাবনা হয়···

প্রবীর কহিল—ভাবনার দরকার নেই। কাল না হয় ডাক্তার বাবুকে আনান্। তাঁকে বলে' একটা এমন ব্যবস্থা করা যাক,···

ডাক্তার আসিলেন। দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যান্। এখানে শরীর সারতে যদি ছ'মাস সময় লাগে তো চেঞ্জে গেলে দু'এক মাসের মধ্যেই recoup করতে পারবে'খন্..

সেই ব্যবস্থাই ভালো। দেখিয়া-শুনিয়া স্থির হইল, রাঁচি। বেশী দূরে নয়।...প্রবীর মাঝে মাঝে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবে...

কিন্তু সঙ্গে যাইবে কে?

প্রবীর কহিল,—দীনেশ বাবু যাবেন আর নার্শ মোহিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যান্। মানুষটি ভালো...ছেলেমেয়ের যত্ন জানেন···আপনিও কথা কইবার লোক পাবেন!...

উদ্যোগ-আয়োজন চলিল।

রাণু শুনিল। শুনিয়া কহিল—মামাবাবু যাবেন না?…বা রে, তাহলে আমি যাবো না!

নীলিমার এইখানে বাধিতেছিল! শূন্য ঘরে প্রবীর যে-পূর্ণতা আনিয়া দিয়াছে—নিত্য দিনের আলাপে-গল্পে হাস্যে-ভাষ্যে পাষাণ-পুরীর কঠিন বুকে যেন স্নিগ্ধ জীবন-প্রবাহ বহিতে সুরু করিয়াছে!

কিন্তু কি করিয়া প্রবীরকে যাইতে বলিবে? তার নিজের ঘর আছে, কাজ আছে,…

গেলে খুব ভালো হয়।…না গেলে রাঁচি কেমন লাগিবে…

যেমন লাগুক, প্রবীরকে যাওয়ার কথা বলা গেল না। বলিতে গিয়া মনে হইল, বলা বুঝি অনুচিত হইবে!

করুণা…না চাহিতে যেটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু লইয়াই খুশী থাকা উচিত। মাত্রা ছাপিয়া করুণা চাহিতে গেলে যদি আঘাত লাগে!

তাছাড়া একান্তে বসিয়া নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে গিয়া নীলিমা একদিন শিহরিয়া উঠিল! প্রবীর যেন জীবনটাকে ভরিয়া তুলিয়াছে—কাণায়-কাণায়! প্রবীর ছাড়া নিজের অস্তিত্ব নীলিমা আজ খুঁজিয়া পাইল না। সকল কাজে সকল চিন্তায় কখন যে প্রবীরের উপর পূরাপুরি নির্ভর রক্ষা করিয়াছে…জানে না! তবে এটুকু জানিয়াছে, রাঁচিতে গেলে প্রবীরকে আর একদণ্ড দূরে রাখিয়া বাঁচা চলিবে না!…

পাষাণ

এ কি মূঢ়তা ! ছি !…

তারপর নির্দ্ধারিত দিনে রাঁচি যাত্রা করিতে হইল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া প্রবীর সহসা বলিল—একটা কথা মনে হচ্ছিল…

নীলিমার মন বেদনায় ভরিয়া এমন হইয়া আছে যে মুখে কোনো কথা বলিতে পারিল না। বাষ্পোচ্ছ্বাসে অস্পষ্ট চোখের দৃষ্টি লইয়া প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রবীর কহিল—আপনাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে গুছিয়ে ব্যবস্থা করে আসতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম…

নীলিমার মনের মেঘ-বাষ্প যেন এ-কথায় বাতাসের পরশ পাইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। অশ্রু-ভরা চোখে আনন্দের ফিনিক্ ফুটিল…

নীলিমা বলিল—যেতে কে বারণ করেছে ?

প্রবীর কহিল—একখানা টিকিট কিনে আনি তাহলে…রিটার্ণ-টিকিট কিনি। দুদিনে গোছগাছ করে নিতে পারবেন না ?

নীলিমা কহিল—পারবো।

প্রবীর টিকিট কিনিয়া আনিল।

তারপর ট্রেণ ছাড়িলে প্রবীর যখন নামিল না, তখন মোহিনী কহিল—মনে মনে আমি এই চাইছিলুম…

প্রবীর কহিল,—কি চাইছিলেন ?

—আপনি যেন সঙ্গে যান…

প্রবীর কহিল—আপনার মনের সেই খপর পেয়েই তো আমি রাঁচি চলেছি…

রাণু কহিল—মামাবাবু তাহলে রাঁচি যাবেন?

প্রবীর কহিল,—হ্যাঁ।

আনন্দে রাণু যেন নাচিয়া উঠিল, কহিল,—কেমন…আমি বলেছিলুম যেতে…

প্রবীর কহিল—তাইতো আমাকে যেতে হলো।

মোরাবাদি পাহাড়ের কাছে ছোট্ট বাড়ী। বাড়ীর সঙ্গে কম্পাউণ্ড আছে। সেখানে পুটুশের সঙ্গে নানাজাতের মশুমী ফুলের গাছ! বাড়ীর সামনে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর; পিছনে মোরাবাদি পাহাড়। মোরাবাদি পাহাড়ে বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া মোহিনী রাণুকে লইয়া আগাইয়া গেল। নীলিমা বসিল। বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া নীলিমা কহিল—এত চমৎকার লাগছে!…কি মনে হচ্ছে, জানেন?

প্রবীর কহিল—কি?

নীলিমা বলিল—যেন খাঁচার মধ্যে এতদিন বন্দী ছিলুম,…খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়েছি…

প্রবীর কহিল—আপনি যে বন্দী হয়েছিলেন, সে তো আপনার নিজের ইচ্ছায়! মনে করলেই খাঁচা ছেড়ে বাইরে আসতে পারতেন! কেউ বারণ করেছিল?

নীলিমা কহিল,—না।

প্রবীর কহিল—তবে ?

নীলিমা কোনো জবাব দিল না,—উদাস নয়নের দৃষ্টি মেলিয়া সুদূর শ্যামল প্রান্তরের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রবীর কহিল—কেন যে অমন অন্ধকার রচনা করে চারিদিকে আড়াল তুলে বসেছিলেন...আমার মনে সে-কৌতূহল আজো জাগে !

নীলিমা তবু কোনো কথা কহিল না, প্রবীরের পানে ফিরিয়া চাহিল না। দৃষ্টি উদাস...তেমনি অবিচল...

প্রবীর কহিল—আমি বুঝি, এ-বয়সে শোকের যে আঘাত পেয়েছেন, তার বেদনা খুবই গভীর ! কিন্তু···

নীলিমা এ-কথায় ফিরিয়া চাহিল···তার দৃষ্টিতে আতঙ্কের ভাব !

প্রবীর তাহা লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল—কিন্তু সে বেদনা নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না। জগতে আরো পাঁচজন বাস করছে···নিজেকেও যখন বেঁচে বাস করতে হবে, তখন পাঁচজনের পানে না চাইলে আমাদের চলে না !...আর কারো জন্য না হোক, অন্ততঃ রাণুর কথা মনে করে আপনি···

নীলিমা আর সহিতে পারিল না ! অসহ্য আবেগে বলিয়া উঠিল,—না, না, তা নয়···

প্রবীর বিস্ময় বোধ করিল, কহিল—তার মানে ?

নীলিমা কহিল—বাইরের বাতাসকে আমার কেমন ভয় করে··· এখনো করে।...এখন করছে না। তার কারণ, আপনি কাছে আছেন, তাই ..

প্রবীর চুপ করিয়া নীলিমাকে নিরীক্ষণ করিল···নীলিমার পাণ্ডুর

মুখে ভয়ের ছায়া মিলায় নাই! দু' চোখে অসহায় কাতরতার আভাস!

প্রবীর কহিল—কেন এ ভয় হবে? জোর করে মন থেকে এ অকারণ আতঙ্ক দূর করা চাই...

আর্ত্ত স্বরে নীলিমা বলিল—তা নয়, তা নয়। সে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আপনি বুঝবেন না...কেন এত ভয় করে। সে কেমন ভয়...ওখানে গণ্ডীর মধ্যে বাস করি, তবু সারাক্ষণ গা ছম্‌ছম্‌ করে...

বাষ্পোচ্ছ্বাসে নীলিমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

প্রবীর কহিল—বেশ, বাড়ীতে গা ছম্‌ছম্‌ করতো, ভয় হতো...তার না হয় কারণ বুঝলুম। কিন্তু এখানে ভয় হবে কেন? এখানে তো পুরোনো স্মৃতির চিহ্ন নেই...

নীলিমা কহিল,—সে আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না! সে যে কি-রকম ভয়...

নীলিমা মাথা নামাইল।

প্রবীর তার পানে চাহিয়া রহিল নীরবে। এ পাষাণ-প্রতিমাকে কি রহস্য যে ঘিরিয়া রাখিয়াছে...কথা কহিতে-কহিতে কেমন উন্মনা হয়! চোখে হাসির দীপ্তি, সহসা সে দীপ্তি বিজলী-বাতির মতো চকিতে নিবিয়া যায়...দু' চোখে রাজ্যের মেঘ যেন ঘনাইয়া নামিয়া আসে!

প্রবীর তাহা দেখিয়াছে। দেখিয়া তার মনে হাজার প্রশ্ন মাথা খাড়া করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন করিতে পারে নাই। সঙ্কোচে-দ্বিধায় সে সব প্রশ্ন মাথা নীচু করিয়া মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে...

পাষাণ

কেন? কেন এ ভয়? কিসের জন্য এমন আতঙ্ক?

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর প্রবীর কহিল,—কি ভাবছেন?

নীলিমা মুখ তুলিল, কহিল—কিছু নয়...

প্রবীর কহিল—চলুন, বেড়াবেন। রাণুরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, ওদের কাছে যাই...

নীলিমা উঠিল।

পাহাড়ের কোলে ঝোপের গায়ে একরাশ পাহাড়ী ফুল ফুটিয়া আছে। রাণু মহানন্দে ফুল তুলিতেছিল। প্রবীর আসিয়া ডাকিল—রাণু...

একরাশ ফুল লইয়া রাণু আসিয়া কহিল—এ ফুলের কি নাম মামাবাবু?

হাসিয়া প্রবীর কহিল—আমি তো বটানি পড়িনি। ওর ঠিক নাম জানি না...

রাণু কহিল—তাহলে এ-সব ফুলের নাম নেই? কিন্তু বারে, কি বলবো?

প্রবীর কহিল—পাহাড়ী ফুল!

—চমৎকার...না মা? বলিয়া ফুলগুলি রাণু নীলিমার হাতে দিল।

প্রবীর কহিল,—বটে! আমাকে একটিও দিলে না!

রাণু কহিল—বাবাঃ বাবাঃ—অমনি হিংসে হলো! আগে দেখুন, দিই কি না...অত ফুল রয়েছে...পাড়বো তবে তো দেবো...

প্রবীর কহিল—বটে! তাহলে আর হিংসে করবো না। তুমি ফুল তোলো...

মোহিনী কতকগুলা নুড়ি লইয়া বাছিতেছিল...প্রবীর কহিল—শুনচেন?

মোহিনী বলিল—বলুন···

প্রবীর কহিল—একটা কথা রাখবেন?

—কি কথা?

প্রবীর কহিল—আমাদের একটা গান শোনাবেন?

মোহিনী কহিল—আমি গান জানি, এ খপর কোথায় পেলেন?

—রাণুর কাছে। তাছাড়া নিজেও একটু স্বকর্ণে শুনেছি সেদিন...

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে মোহিনী চাহিল প্রবীরের পানে।

প্রবীর কহিল—যেদিন রাঁচি এলুম, আমি বাজারে গিয়েছিলুম—আপনি ঘর গুচোচ্ছিলেন...সন্ধ্যার সময় লণ্ঠন কিনে আমি ফিরলুম। আপনি ঘর গুছোতে-গুছোতে গুণ-গুণ করে গান গাইছিলেন·· আমার সাড়া পেতে গান বন্ধ হলো...

মোহিনী কহিল—আপনি বুঝি শুনেছিলেন? দে·· তো আপনার অন্যায়!

—অন্যায় কিসে?

—নয়? আমি জানি, আপনি শোনেন নি···

প্রবীর কহিল—আপনি জানতে পারেন নি বলে আমার অন্যায় হলো? বটে! এমন কোনো কথা ছিল না তো যে আমি বাড়ী

ঢোকবামাত্র সাড়া দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেবো, আমি এসেছি··· গাইয়ে-লোক হুঁশিয়ার !···বলুন, এমন কথা ছিল কি ?

সলজ্জ ভাবে মোহিনী কহিল,—তা নয়।

—তবে ?

মোহিনী কহিল—তাকে গান গাওয়া বলে না···

—তাকে কি বলে ?

মোহিনী কহিল,—তাকে বলে ছড়া-আওড়ানো···

প্রবীর কহিল,—বেশ, তাহলে সেই ছড়াই না হয় দু' একটা আওড়ান্ ! পাহাড়ের কোলে আদিম আবহাওয়ায় আপনার আদিম-ছড়া আমাদের চমৎকার লাগবে।···

মোহিনী মুক্তি পাইল না। তাকে গাহিতে হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মনস্তত্ত্ব

রাঁচির রিটার্ণ-টিকিটের গণা-পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। প্রবীর বলিল—আজ আমি কলকাতায় ফিরবো...

মোহিনী কহিল—এর মধ্যে? এখানকার আবহাওয়া আমাদের সইবে কি না, তা তো এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

প্রবীর কহিল—আমার টিকিটের পরমায়ু যে আর থাকে না!

মোহিনী কহিল—এ টিকিটের পরমায়ু যায়, অন্য টিকিট নিয়ে কলকাতায় ফেরা চলে...

প্রবীর কহিল—কাজ-কর্ম্ম আছে...সকলের সেখানে অসুবিধা হচ্ছে।

মোহিনী কহিল—তাহলে থাক্‌তে বলা চলে না।

নীলিমা কোনো কথা বলিল না। রাণু আপত্তি তুলিল প্রবল রকম।

প্রবীর কহিল—আবার আসবো'খন...

রাণু কহিল—কবে আসবেন?

প্রবীর কহিল—দশ-পনেরো দিন পরে।

রাণু যেন আঁৎকাইয়া উঠিল! কহিল—বাবাঃ, পনেরো দিন পরে? সে যে অনেক দিন…

প্রবীর কহিল—অনেকদিন নয় রাণু…পনেরো দিন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে!…

প্রবীর রহিল না। মন ফিরিতে চায় না! কিন্তু মনের এ আবদার রক্ষা করাও চলে না! লোকে কি বলিবে? লোকের কথা মনে জাগিবা-মাত্র চারিদিক হইতে মনের মধ্যে একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিল।… হাজার প্রশ্ন…

লোকে কি বলিবে! কেন বলিবে?…

অনেক করিয়াও এ প্রশ্নের কোনো জবাব মিলিল না। কাজেই থাকা ঘটিল না।

ষ্টেশনে সকলে আসিয়াছিল ভাড়া-মোটরে। প্রবীর প্রতিবেশীদের বলিয়া আসিল, আপনারা একটু দেখিবেন-শুনিবেন ইত্যাদি…

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রবীর দেখিতে লাগিল…যতক্ষণ দেখা যায়…

চোখের উপরে বড় করিয়া বিম্বিত হইয়াছিল নীলিমার জল-ভরা দুটি করুণ চোখ! সে-চোখের দৃষ্টি মনকে অশ্রু-সজল করিয়া তুলিল…

তার পর ট্রেন চলিল হু-হু বেগে। প্রবীর শীটে বসিয়া পা ছড়াইয়া দিল…

মন কেবলি বলিতে লাগিল, ভালো লাগে…ভালো লাগে…ভালো লাগে!

মনকে অলক্ষ্যে কশাঘাত করিয়া কে বলিল—কেন ভালো লাগিবে ? নীলিমাকে এত বেশী ভালো লাগা উচিত নয় !…

মন বলিল, নীলিমা নয়। রাণু! প্রবীর ছাড়া রাণুকে দেখিবার কে আছে ?

কশা বলিল, আছে বৈ কি ! দীনেশবাবু আছেন। নীলিমা আছে। মোহিনী আছে। দাসী আছে। চাকর আছে।

কিন্তু সেদিন যে নীলিমা বলিল, ভয় করে। গা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে !…কেন এ আতঙ্ক, বলিয়া বুঝাইবার নয় !…

এ আতঙ্কের আবরণ ভাঙ্গিয়া নীলিমাকে য[illegible] মুক্ত করিতে না পারে; নীলিমা বাঁচিবে কি করিয়া ?

কশা বলিল, ক'মাস আগে নীলিমা কোথায় ছিল, বাপু ?

মন বলিল, তখনকার কথায় কিছু আসিয়া যায় না! এখন যখন জানিয়াছে নীলিমা নীরবে দারুণ বেদনা ভোগ করিতেছে…সে-বেদনায় যদি সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাকে না দেখা হইবে দারুণ কাপুরুষতা!

কশা বলিল, কিন্তু এ দরদ কি শুধু ঐ বেদনাটুকুর জন্য ?

মন সদর্পে বলিল, নিশ্চয়…

কশা অট্টহাস্য করিল। করিয়া বলিল, নীলিমার চেয়ে আরো কত গভীর বেদনা সহিতেছে কত লোক…তাদের সে-বেদনার সন্ধান তো কোনোদিন লইতে দেখিলাম না!…আসলে এ-দরদের অন্য কারণ আছে! কশার এ-কথায় মন কাঁপিয়া উঠিল…

কশা বলিল, একাকিনী তরুণী…তোমার উপর নির্ভর। তাই তুমি লোলুপ হইতেছ !

বেত্রাহতের মতো কুণ্ঠায় মন লুটাইয়া পড়িল, বলিল, চুপ চুপ চুপ…এ কথা বাতাসে এমন করিয়া উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়ো না…

কোনমতে মনকে ঘুম পাড়াইয়া প্রবীর চাহিল বাহিরের পানে। পড়ন্ত রৌদ্র গায়ে মাখিয়া আশপাশের গাছপালা, ক্ষেত, পাহাড়, জলা-বিল সরিয়া সরিয়া পিছনে চলিয়াছে…নীলিমার কাছে। নীলিমাকে উহারা তার মনের এ গোপন কথা বলিয়া দিবে না তো ?

গাছপালার সঙ্গে মন ছুটিল পিছনে রাঁচির পথে। দেহখানা ট্রেনে চড়িয়া রাঁচি ছাড়িয়া দূরে আরো দূরে চলিয়াছে…চলিয়াছে…

ক'দিনে নীলিমার মনে যেন সাড়া জাগিতেছিল। আরো দু' দশ দিনে হয়তো ও-মন জাগিয়া উঠিবে! তখন কোথায় থাকিবে প্রবীর ?

প্রবীর আবার ভাবিতে বসিল…

তার পর কলিকাতা। কাজ…কাজ…কাজ…

কাজের পাহাড়ে বসিয়া একটু বিরাম পাইলেই মন ছোটে রাঁচিতে…

কলিকাতায় আসিয়া ছোট-একটা পোষ্টকার্ড সে লিখিয়াছিল রাণুর নামে রাঁচিতে। লিখিয়াছিল,

আমি নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছি। মাকে খপর দিয়ো। কেমন আছো ? দু'বেলা রোজ মাসিমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইয়ো—মাকে সঙ্গে লইয়ো। তাঁকে বাড়িতে রাখিয়া যাইয়ো না। আমার স্নেহ-ভালোবাসা জানিবে।

ইতি মামাবাবু

উত্তরের আশায় দু'দিন, চারদিন কাটিয়া গেল। কোনো উত্তর আসিল না। মন অস্থির হইয়া রহিল।...

আর একখানা চিঠি লিখিল রাণুর নামে—

রাণু তোমরা কেমন আছো শীঘ্র লিখিয়া জানাইবে। আমি ভাবিত আছি।

মামাবাবু

এ চিঠির উত্তর আসিল পোষ্টকার্ডে; আঁকা-বাঁকা অক্ষরে। রাণু লিখিয়াছে,

আমরা ভালো আছি। হাতের লেখা খারাপ। ভালো লিখিতে পারি না। আপনি কেমন আছেন, লিখিবেন। কবে আসিবেন? প্রণাম জানিবেন।

স্নেহের রাণু

প্রবীরের জবাব লিখিতে ত্বর সহিল না। তখনি জবাব লিখিয়া ডাকে পাঠাইল।

এমন হইল যে, কাজ-কর্ম্ম, চলাফেরা—এগুলা যেন মনকে স্পর্শ করে না! কোনমতে দিনের গা বহিয়া কাজ-কর্ম্ম চলাফেরা ঢেউয়ের মতো চলিয়া যায়! চিঠি পাওয়া এবং সে-চিঠির জবাব লিখিয়া পাঠানো—ইহাই হইল নিত্যকার আসল কাজ! চিঠি লিখিয়া মন রাঁচির পানে চাহিয়া থাকে। এ চিঠি পড়িয়া সেখানে আনন্দ-বেদনায় কখানি রৌদ্রমেঘের খেলা চলিবে! তারপর সে ভাবিতে বসে, এখনি জবাব লিখিবে? না, সন্ধ্যার পর? মন ক্রমে প্রশ্ন তুলিতে লাগিল, এ চিঠি সে লেখে... রাণু নিজে? না, নীলিমা? হাতের অক্ষর ভালো নয়! রোগে ভুগিয়া

লেখার পুরানো ছাঁদ এখনো ফেরে নাই! কিন্তু বাণান? বাণান অমন নিভুল হয়...নিশ্চয় নীলিমা বলিয়া দেয়। নহিলে...

সেদিন চিঠি লিখিবার সময় মন বার-বার বলিতে লাগিল, এ চিঠি আসলে তুমি লিখিতেছ নীলিমাকে! রাণু শুধু উপলক্ষ! এ চিঠি পড়ে নীলিমা...এ চিঠির জবাব দেয় নীলিমা! কেন এ ছলনা বাপু?

সত্য? বেশ, বারণ করিয়া দিব!

তাই সেদিন প্রবীর চিঠি লিখিল,

কল্যাণীয়াসু

রাণু

তোমার চিঠি পড়িয়া কোনো খপর পাই না; দুটি লাইনে শুধু ভালো আছি, কেমন আছেন? ব্যস্! তোমরা কি করিতেছ, বেড়ানো কেমন চলিতেছে, এ সব খপর কি করিয়া পাই, বলো?

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রবীর ভাবিল, ছোট একটু আঘাত দিলে কেমন হয়? তাই লিখিল,

আমি শীঘ্র যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। এখানে অনেক কাজ। যাওয়া অসম্ভব।

লিখিয়া এ পত্র সে বার-বার পড়িল। ভাবিল, এ তো সহজ কথা!... তা নয়, মনে হইতেছে আরো একটু কঠিন করিয়া লেখা যাক্। লিখিল,

আশা করি, এতদিনে আমার অভাব আর বোধ করিতেছ না! বোধ হয় আশে-পাশে তোমাদের অনেক বন্ধু মিলিয়াছে!

সারাদিন কি করো? মোহিনী মাসিমাকে খুব জ্বালাতন করো নিশ্চয়?

এ ক'দিন নতুন কিছু দেখিলে কি না,কোনো নতুন লোকের সঙ্গে ভাব হইল কি না—সব কথা খুলিয়া লিখিয়ো।

লিখিল, আমি ভাল আছি

লিখিয়া তখনি কাটিয়া দিল। না, না, এ কথা নয়। তার চেয়ে... ও-কথা কাটিয়া লিখিল,

কাজের ভিড়ে এক-একদিন এমন হয় রাত্রি প্রায় বারোটায় ফরাশডাঙ্গায় ফিরি। মাঝে একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরের মতো হইয়াছিল। কিন্তু আপনা হইতে সারিয়া গিয়াছে। একটু সময় পাইলে তোমার জন্য কিছু খেলনা পাঠাইয়া দিব। যদি একখানি ছোট মোটর-গাড়ী পাঠাইয়া দিই, কেমন হয়? সে গাড়ীতে চড়িয়া মোহিনী মাসিমার সঙ্গে বেড়াইতে যাও—না?

আশা করি তোমরা ভালো আছ। তোমরা আমার ভালোবাসা জানিবে। এবার বড় চিঠি লিখিয়ো।

মামাবাবু

লেখা শেষ করিয়া বার-বার চিঠি পড়িল। মন বলিতে লাগিল, এত কথা লিখিয়াছ! কিন্তু আসল কথাটি?

হাত চুপ করিয়া রহিল না; মনের কথায় সায় দিয়া হাত লিখিল,

পুঃ। তোমার মা তোমার সঙ্গে বেড়াইতে যান তো? তাঁকে ঘরে একা রাখিয়া যাইয়ো না।

মামাবাবু

এ-চিঠি ডাকে দিয়া প্রবীর বসিয়া আপন-মনে স্বপ্নজাল রচনা করিতে লাগিল।...

রাজ্যের অর্ডার সংগ্রহ করিয়া এবং সে অর্ডার সাপ্লাই করিতে

পারিলেই কি জীবনটা সার্থক হইয়া যাইবে? টাকা-পয়সার হিসাব—ব্যাঙ্কের তহবিল কাঁপানো—এ ছাড়া জীবনে চাহিবার মতো কিছু নাই?

মন তো টাকা-পয়সার পাহাড়ে চড়িয়া তৃপ্তি পায় না! অর্ডারের পর অর্ডার আসিতেছে! বাজারে এমন নাম, এত প্রতিপত্তি...তবু মনের কোণে তৃপ্তি কৈ? সুখ কৈ?...

অফিসের কামাক্ষীবাবু আসিয়া বলিলেন—আমাকে দিন পনেরোর ছুটী দিতে হবে, খোকাবাবু।

প্রবীর কহিল,—ছুটী! কেন?

কামাক্ষীবাবু বলিলেন—ছোট ছেলেটি বড্ড ভুগেছে। তাই সকলকে রাঁচি পাঠাচ্ছি হাওয়া বদলাতে...ওদের নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে দিন পনেরো থেকে ব্যবস্থা পাকা করে আসতে চাই।

প্রবীর কহিল—ম্যানেজার-বাবুকে দরখাস্ত দিন। তাঁকে বলবেন, আমি ছুটী মঞ্জুর করেছি।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কামাক্ষীবাবু চলিয়া গেলেন।

প্রবীর ভাবিল, জীবনে সকলের একটা প্রলোভন আছে! সকলে এতখানি এই যে পরিশ্রম করিতেছে অপরের সুখ চাহিয়া! সে...

জীবনে কি চাহিতে হয়...কি পাইলে জীবন ভরিয়া ওঠে, তার কিছুই সে জানিল না!...প্রবীর এতকাল লেখাপড়া করিয়াছে। অধ্যয়ন-তপস্যা! এখন তপস্যা ছাড়িয়া পয়সার দাস্য!...কিন্তু এ পয়সা কাহার জন্য?

মন কি এ পয়সা চায় একান্ত ভাবে? না...

মন হু-হু করিয়া উঠিল। চারিদিকে দারুণ শূন্যতা! প্রবীর শিহরিয়া উঠিল।...

কাজ-কর্ম্মের পর বাড়ীর পথে রাণুদের বাড়ী।...এ বাড়ীতে আসিলে কোথা দিয়া কি স্বস্তি যে মনে পাইত!...আজ...?

বাড়ী ফিরিয়া মনে হয় বাড়ীতে লোক আছে, জন আছে! তবু কি নিঃসঙ্গতা! আশেপাশে যেন কেহ নাই!...দুদণ্ড কথা কহিবে, হাসিয়া যার সঙ্গে গল্প করিবে...এমন লোক কেহ নাই!

মন বলিল, কেন মাসিমা? সুনীতি?

বাড়ীতে থাকিতে পারিল না...প্রবীর ছুটিল সুনীতিদের বাড়ী।

দোতলার ঘরে অর্গান বাজাইয়া সুনীতি গান গাহিতেছিল—

ওগো এত ভালোবাসা, প্রাণের তিয়াষা
কেমন আছে সে পাশরি

গানের কথাগুলা বুকে বাজিল পাথরের কুচির মতো...

এত ভালোবাসা...প্রাণের তিয়াষা...

তাই কি প্রবীরের মনে এমন শূন্যতা!...

প্রবীর ধীরে-ধীরে দোতলার ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ছিলেন হেমপ্রভা। ওয়াড়ে ঝালর আঁটিতেছেন। প্রবীরকে দেখিলেন; দেখিয়া বলিলেন—এসো বাবা...

সুনীতির গান থামিল। প্রবীর ঘরে আসিল।

হেমপ্রভা কহিলেন—রাঁচি থেকে কবে ফিরলে?

প্রবীর কহিল—অনেক দিন…

—ও! আমি শুনিনি। আগে ইনি একদিন গিয়েছিলেন… তোমার মেসোমশায়। এসে বললেন, প্রবীর রাঁচি গেছে গো, তারাশঙ্করবাবুর মেয়েকে আর বৌকে পেঁীছে দিতে। তা তাদের খপর ভালো ?

প্রবীর কহিল—ভালো।

হেমপ্রভা কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন! প্রবীর বুঝিল; বুঝিয়া হাসিল। হাসিয়া কহিল,—আমি বিরক্ত করলুম না তো মাসিমা?

হেমপ্রভা বলিল,—সে কি! বিরক্ত করবে কেন?

প্রবীর কহিল—না হলে গান থেমে গেল…সুনীতি অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলো! দেখুন না…

সুনীতি কহিল—ত্মাখো তো মা, প্রবীরদা সব সময়ে আমার সঙ্গে কোঁদল করবে…

হাসিয়া হেমপ্রভা বলিলেন—তোকে ক্ষ্যাপায়…তুই যা বোকা!

সুনীতি কহিল,—হ্যাঁ, তা বৈ কি!

প্রবীর কহিল—আপনার ভুল মাসিমা। আপনার মেয়েটি মোটেই বোকা নয়।

হেমপ্রভা বলিলেন,—তোমরা গল্প করো, বাবা। আমি আসছি। আজ আবার বামুন-ঠাকুরের অসুখ করেছে। আমার ঘাড়ে রান্নার ভার। তা, এখানে খেয়ে যাও না বাবা আজ রাত্রে। আমি রাঁধছি…

প্রবীর কহিল—সে সৌভাগ্যে আজ বঞ্চিত থাকতে হবে মাসিমা। বাড়ীতে পেট ভরে খেয়ে তবে বাইরে বেরিয়েছি।

হেমপ্রভা অনুযোগ করিলেন,—এ… আসছো যখন, তখন না খেয়ে এলেই পারতে…তোমার মাসিমার আজো এমন দুর্দ্দশা হয়নি বাবা…

প্রবীর কহিল—আসবো বলে আসিনি মাসিমা, সত্যি। একলাটি ভালো লাগলো না কি না, তাই চলে এলুম। ভাবলুম, অনেকদিন আসিনি…

হেমপ্রভা বলিলেন—তা বসো বাবা। আর কিছু না মুখে দাও, ডিমের বড়া ভাজছি, দুখানা চেখে দেখো…

হেমপ্রভা বসিলেন না; চলিয়া গেলেন।

প্রবীর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুনীতি কহিল—রাঁচির খপর পেলেন?

প্রবীর কহিল,—হ্যাঁ।

—সকলে ভালো আছে?

প্রবীর কহিল,—রাণু লিখেছে, ভালো আছে।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল…

প্রবীর কহিল,—কথার পুঁজি এর মধ্যে ফুরিয়ে গে ?…কি ভাবচো?

সুনীতি কহিল,—কিছু না।

—বলো না, শুনি।

—শুনবেন? রাগ করবেন না?

প্রবীর কহিল,—না।

সুনীতি কহিল,—আপনার আজ হঠাৎ এ দয়া কেন হলো, তাই ভাবছিলুম।

—দয়া!

—নয়? আপিসে আপনি রাত পর্য্যন্ত কাজ করেন না—বাড়ী ফেরেন নিশ্চয়। এ পথে আসবার কথা কোনো দিন তো মনে হয় না।

প্রবীর কহিল,—আমি তো কোথাও যাই না।

সুনীতি বলিল,—এখন যান না। আগে যেতেন...

প্রবীর কহিল—ও...তা, হ্যাঁ, মানে, ওঁদের বাড়ী তো? রাণুর কি-রকম অসুখ গেল, বলো দিকিনি!

সুনীতি কহিল—তাই ভাবি, আমার কেন অমন অসুখ করে না?...আপনি তাহলে কি করেন, দেখি একবার। মানে, খুব শক্ত অসুখ...

কথা শেষ হইল না। অভিমানের উচ্ছ্বাসে কথা উবিয়া গেল।

প্রবীর কোনো জবাব দিল না; সুনীতির পানে চাহিয়া রহিল। স্তব্ধ অবিচল দৃষ্টি! সহসা মনে হইল, এভাবে চুপ করিয়া থাকা ঠিক হইতেছে না! সুনীতি যে-কথা বলিয়াছে, সে কথার পিছনে ছোট একটু হুল। সে হুল মনে বসিতে দেওয়া ঠিক নয়!

প্রবীর কহিল—গান গাও। বেশ তো গাইছিলে...

সুনীতি কহিল—গাইবো না...আমি কোনো দিন আর গাইবো না। গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। মা বড্ড জেদ করে, আজ...বল্লে, রবিবাবুর সেই পুরোনো গানটা গা...

একটা আঘাত দিবার লোভ প্রবীর সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল,—ও...ফরমাশে গাইছিলে! আমি ভেবেছিলুম...

সুনীতির দুই গালে রক্ত গোলাপ ফুটিল। তীব্র রক্তোচ্ছ্বাস!

তার ফলে সারা মুখ চক্রাকারে ফুলিয়া উঠিল ! সুনীতি বলিল—কি ভেবেছিলেন ?

প্রবীর কহিল,—বুঝি কোনো ভাগ্যবান…

—যান, আপনি ভয়ঙ্কর দুষ্টু ! কেন এ-সব যা-তা ঠাট্টা করেন আমাকে, বলুন তো ? না, আপনি এ-সব কথা বলবেন না। যত বলছি, মা আমাকে বললে ঐ গানটা গাইতে...

চকিতে সুনীতি যেন উচ্ছ্বাসে প্রচ্ছ্বাসে ঝড়ের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল।

প্রবীর কহিল—তাই, তাই। বেশ, আমি মেনে নিলুম !

কথাগুলা এক-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া সুনীতি পর-মুহূর্ত্তে লজ্জা বোধ করিল ; সরিয়া একেবারে গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল…

প্রবীর কহিল—শোনো সুনীতি, দুষ্ট-কুঁদুলে লোক চলে যাচ্ছে। তুমি স্থির হও ..

কথাটা বলিয়া প্রবীর উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুনীতি ছুটিয়া তার কাছে আসিল। বলিল,—না, আপনি যাবেন না। আর আমি আপনাকে দুষ্টু বলবো না।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রবীর কহিল—মুখে না বলো, মনে মনে তো জেনে রেখেচো, আমি দুষ্টু, আমি বদ, আমি কুঁদুলে, আমি যা-তা কথা বলি…

সুনীতি কহিল—বাবাঃ বাবাঃ ! তিলকে তাল করে এমন কাণ্ড আপনি বাধাতে পারেন।

প্রবীর কহিল—সুনীতি দেবী গানটি শেষ না করলে বেতালা ছন্দে আমি আরো কোঁদল-রাগিণী ভাঁজবো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি গাইছি, গাইছি...কিন্তু ও-গান নয়। আর একটা···

প্রবীর কহিল—না, ঐ গানটি আমি শুনতে চাই। এত ভালো লাগছিল...

সুনীতির মজা লাগিল। শোধ দিবার জন্য ধাঁ করিয়া সে বলিয়া বসিল,—এত বেদনা আপনার মনে জাগলো কার জন্য প্রবীরদা? রাঁচির জন্য না কি?

বলিয়াই চমকিয়া জিভ কাটিল। প্রবীরের মুখ এ কথায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে···

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘটনা-চক্র

দু'দিন পরে রাঁচির চিঠি আসিল। বড় চিঠি নয়। চিঠির তলায় রাণুর নাম। কিন্তু হাতের লেখা রাণুর নয়। চিঠিতে লেখা আছে,

মামাবাবু,

আপনি আসিবেন না শুনিয়া আমার মনে খুব দুঃখ হইয়াছে। এত মন কেমন করিতেছে যে সকলের আড়ালে শুধু কাঁদিতেছি।

আপনি আসিবেন। একদিনের জন্য অন্ততঃ আসিবেন। এমন করিয়া নির্জ্জন বনবাসে রাখিয়া কি করিয়া আপনি আছেন? আমাদের দিন যে কাটিতে চায় না। আপনি নিশ্চয় নিশ্চয় আসিবেন। আপনি না আসিলে আমাদের সকলের অসুখ হইবে—খুব বেশী অসুখ। তার পর যদি আর না দেখিতে পান, বেশ মজা হ[illegible] তখন।

আপনি আজই আসুন। আপনি আসিলে খুব খুশী হ[illegible] খুব—খুব—খুব।

আপনার রাণু

চিঠির পরে পুনশ্চ আছে,

'আমার হাতের লেখা খারাপ বলিয়া মাকে দিয়া চিঠি লিখাইলাম। চিঠির কথা আমার। শুধু হাতের লেখাটুকু মার।

রাণু

চিঠি পড়িয়া মন আকুল হইয়া উঠিল। না গিয়া তার পক্ষে একাদনও আর এখানে বাঁচিয়া থাকা দায়! স্থির করিল, আজই রাঁচি যাইবে!

তাড়াতাড়ি অফিসে আসিয়া কাজ-কর্ম্মের পরামর্শ চুকাইয়া সকলের অগোচরে প্রবীর মোটর লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ট্রেণের জন্য সারাদিন প্রতীক্ষা করা—অসম্ভব! কথাটা কাহারো কাছে প্রকাশ করিল না—শুধু যাইবার আগে কটা জিনিষ-পত্র কিনিয়া লইল।

রাত্রি প্রায় আটটা। মোরাবাদির বাড়ীর সামনে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে নামিয়া প্রবীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সামনে খোলা বারান্দা। একরাশ জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িয়াছে...

বারান্দায় মৌন মূক প্রতিমার মতো বসিয়া নীলিমা...

প্রবীর একেবারে সামনে আসিয়া ডাকিল—রাণু...

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বসিয়া সে প্রবীরের কথা ভাবিতেছিল! মনে হইল, প্রবীর সত্য আসিয়াছে? না, জাগিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। প্রবীর খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। বলিল,—কি করছেন?

ঘোর কাটিল। স্বপ্ন নয়! হাসিয়া নীলিমা কহিল—আপনি?

—হ্যাঁ।

—ছেড়ে দিন। চমকে উঠেছিলুম। সে-ভাব সেরে গেছে।

প্রবীর হাত ছাড়িয়া দিল, কহিল,—রাণু?

—ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকি।

—না, থাক। কাল সকালে আমাকে দেখে চমকে উঠবে'খন। মোহিনী কোথায় ?

নীলিমা কহিল—পাশের বাড়ীতে একটি ছেলের অসুখ...তার মা তাই এখন একবার ডেকেছিলেন বার্লি তৈরী করে দেবার জন্য। গেছে।

হাসিয়া প্রবীর কহিল—সাধে বলে, ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে গেলেও ধান-ভানার ছুটি মেলে না !

নীলিমা কহিল—এখন এলেন কিসে ?

প্রবীর কহিল—মোটরে।

—হঠাৎ ?

প্রবীর কহিল—এলুম...আগে গাড়ীখানা রাখবার ব্যবস্থা করি। ওদিককার বাঙলায় গেরাজ আছে···যদুপতি বাবুরা এসে আছেন... জানি···

নীলিমা কহিল—দেরী করবেন না...

—না।

প্রবীর চলিয়া গেল। নীলিমা চুপ করিয়া ইয়া রহিল। মনে হইতেছিল, আকাশের জ্যোৎস্না যেন আরো প্রদী ইয়া উঠিয়াছে !

•

সকালে উঠিয়া রাণু অবাক ! কহিল—মামাবাবু ! আপনি !

প্রবীর কহিল,—হ্যাঁ। তুমি খুব দুষ্টু হয়েছ। অমন করে চিঠি লিখেছিলে কেন ? তাই তো আসতে হলো।

রাণু কহিল,—বারে, আমি আবার কি চিঠি লিখলুম আপনাকে··· যার জন্ত আসতে হলো! সেই অনেকদিন আগে তো আমি চিঠি লিখে ছিলুম...

প্রবীর চিঠি বাহির করিয়া কহিল—এ চিঠি তুমি লেখোনি?

চিঠির পানে চাহিয়া রাণুর বিস্ময় বাড়িল। রাণু কহিল—বারে, ও চিঠি আমি কেন লিখবো?···আমার লেখা বুঝি অত ভালো? ও তো মায়ের লেখা...মায়ের চিঠি...

নীলিমা চায়ের পেয়ালা লইয়া আসিতেছিল। এ কথা সে শুনিল। শুনিয়া কাঠ হইয়া রহিল···

প্রবীর দেখিল···

বেড়াইতে বাহির হইয়া মোহিনী বলিল—আমায় একটু ছুটী দিন। ওঁদের ছেলেটিকে একবার দেখতে যেতে হবে। এত-, ফোড়া হয়েছে···ফেটে গেছে। ড্রেশ করে দেবো।

প্রবীর কহিল—আমাকে বয়কট্ করছেন! বেশ, আজ দু'দণ্ডের অতিথি···আজই ফিরে যাবো।

মোহিনী কহিল—আমার দেরী হবে না। আপনারা বরং রাঁচি-হিলের দিকে যান! আমি এখনি আসছি···

তাহাই হইল। রাঁচি-হিলের খানিকটা উঠিয়া রাণু পুটুশ ফুল তুলিতে মত্ত হইল। প্রবীর ও নীলিমা বসিল পাহাড়ের গায়ে।···

প্রবীর কহিল—আপনি তো একটুও সারেন নি। বেড়ান না নিশ্চয় !

নীলিমা কহিল—ভালো লাগে না...

প্রবীর কহিল—এ কথাটুকু যদি না শোনেন, তাহলে আর কখনো আমি আসবো না···সত্যি।

নীলিমার মুখে কাতরতার আভাস···

প্রবীর কহিল—আপনি কথা শুনবেন না, আর আমরা আপনার কথা শুনবো—তা কখনো হতে পারে না। আপনার চিঠি পেয়ে দেখুন তো আসতে আমি এক-নিমেষ দেরী করিনি···

আনন্দে লজ্জায় নীলিমা মুখ তুলিতে পারিল না !

প্রবীর কহিল—এ চিঠি আপনি লিখেছেন, তা আমি বুঝেছিলুম··· তবু মনে একটু সংশয় ছিল···

নীলিমা যেন মাটীতে মিশিয়া যাইবে...

এ-লজ্জা প্রবীরের বড় ভালো লাগিল ! সে বিমুগ্ধ হইল।

প্রবীর বলিল—রাণু যখন বললে এ চিঠির বিন্দুবিসর্গ সে জানে না, তখন মনে এমন আনন্দ হলো···

নীলিমা যেন ঘূর্ণ্যমান গোলকে বসিয়া আছে ! পৃথিবী দুলিতেছে ভীষণ বেগে...

প্রবীর কহিল—এত বড় পৃথিবীতে আমাকে এমন করে কেউ আর কখনো আপন-জন ভাবেনি···

নীলিমা আর পারে না ! মন কাঁদিয়া বলিল, ওগো, তুমি চুপ করো··· বড় বেদনায় মনের কথা সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে···নিমেষের মূঢ়

দুর্ব্বলতা...তুমি যখন ছিলে, মন তখন হু-হু করিত না! যে-পৃথিবীকে শূন্য দেখিত···যে-বাতাসে গা কাঁপিত...সে পৃথিবী, পৃথিবীর সে-বাতাস এত ভালো লাগে! তারপর যেমন তুমি চলিয়া গেলে, আবার সব ঠিক সেই আগেকার মতো হইয়া গেল! তেমনি শূন্যতা...তেমনি ভয়-ভয় ভাব। চিঠি ডাকে দিয়া পরমুহূর্ত্তেই আকুল আর্ত্ত-রবে সে বিধাতাকে ডাকিয়াছে, এ চিঠি তুমি যেন না পাও।···এ চিঠি যেন পথে বাতাস লাগিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়! তার এ নীরব পূজা···নীরব নিবেদন... প্রকাশের লজ্জায় মন এমন হইয়াছে যে মুখ তুলিয়া ঐ চন্দ্র-সূর্য্য আকাশ-পৃথিবী কিছুর পানে সে তাকাইতে পারিতেছে না···

এ আকুলতা তার সাজে না! সমাজের বারণ, শাস্ত্রের বারণ...

প্রবীর কহিল—আমারো ক'দিন এমন হয়েছে...কাজ করেছি, কিন্তু কাজে মন ছিল না! যদি জিজ্ঞাসা করেন কি কাজ করেছি, বলতে পারবো না!···প্রতিদিন সেখানে আমার কি কাজ ছিল, জানেন?

নীলিমা মুখ তুলিয়া চাহিল। দুই চোখে হাজার প্রশ্ন! হাজার বিস্ময়! হাজার আনন্দ-দীপ্তি! হাজার মিনতি! কি যে নাই!

প্রবীর কহিল—কখন রাঁচির চিঠি পাবো! চিঠি পেয়েই জবাব লিখেছি···জবাব লিখে তখনি আবার পরের চিঠির আশায় মন আকুল হয়ে উঠেছে!···ছোট্ট চিঠি···দুটি লাইন, আমরা ভালো আছি আর আপনি কেমন আছেন?...এ দুটি ছোট কথায় কতখানি তৃপ্তি...

প্রবীর থামিল। তারপর উচ্ছ্বসিত আবেগে আবার বলিল,—বড় বড় অর্ডার পেয়ে, সে অর্ডারের টাকা পেয়েও এত তৃপ্তি কোনোদিন পাইনি!...এক এক সময় মনে হয়···

সহসা কে যেন কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল! মনের এ-সব নিগূঢ় কথা উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ করিয়া এ তুই কি করিতে চাস্? নীলিমা কুমারী মেয়ে নয়···বিধবা! তার মেয়ে আছে। স্বামীর স্মৃতি সম্বল করিয়া স্বামীর ধ্যানে সে হয়তো তন্ময়! তার সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া স্বামীর সে স্মৃতি-মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গিয়া তাকে টানিয়া তুই কোথায় আনিতে চাস্?

ধিক্কারে গ্লানিতে মন ভরিয়া উঠিল···কোনোমতে লজ্জা ঢাকিতে প্রবীর বলিল—ঐটুকু মেয়ে রাণু...সে আমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে...

নীলিমা প্রবীরের পানে চাহিয়া ছিল,—অধরে ম্লান হাসির রেখা, চোখে জলের আভাস!

রাণু আসিয়া একরাশ ফুল দু'জনের গায়ে ছড়াইয়া কহিল—নমো নমো নমো···

বলিয়াই হাসিতে সে ফাটিয়া পড়িল। তারপর ঝাঁপাইয়া প্রবীরের উপর পড়িয়া প্রবীরকে ধরিয়া রাণু বলিল—এখানে একটা জায়গা আছে মামাবাবু, মোহিনী-মাসির সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন—সেখানে কত বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুল ফুটে আছে!···একটা মস্ত পুকুর...পুকুরের জলে লাল-নীল কত ফুল! যাবেন সেখানে বিকেলে?

প্রবীর কহিল—কিন্তু বিকেলে তো আমি থাকবো না রাণু।

রাণু কহিল—বিকেলে কোথায় যাবেন?

প্রবীর কহিল—কলকাতায়।...

রাণু নিষেধ তুলিল,—না...আপনি আর কলকাতায় যাবেন না··· আমি যেতে দেবো না। কেন আপনি কেবল-কেবল চলে যাবেন?

প্রবীর কহিল—কলকাতার লোকেরা আসতে দেয় না। বলে এখানে কাজ আছে—কাজ করো।

ক্ষণেক চুপ করিয়া রাণু কি ভাবিল, তারপর কহিল—কি কাজ আপনাকে করতে হয়?

প্রবীর কহিল—শুধু কতকগুলো কাগজে নাম সই করি।

রাণু কহিল—আমি এখানে কাগজ দেবো'খন…অনেক কাগজ… এখানে বসে বসে সেই সব কাগজে নাম সই করবেন। তাহলে হবে তো?

হাসিয়া প্রবীর কহিল—এখানে সে সব কাগজ পাওয়া যায় না যে…

রাণু কহিল—তাহলে কলকাতায় চিঠি লিখে দিন…সেখান থেকে তারা সে-কাগজ পাঠিয়ে দেবে।

এ কথা বলিয়া রাণু চাহিল নীলিমার পানে, বলিল,—তুমি বারণ করো মা। তুমি বারণ করলে মামা-বাবু যাবেন না…

তার পর অভিমানে মুখ ফুলাইল, কহিল,—কেন তবে এলেন…যদি এসেই চলে যাবেন? বা রে!

প্রবীর কহিল—মন-কেমন করছিল যে…

রাণু কহিল—বড়দের তো ঐ মজা! নিজেদের মন-কেমন করলে তখনি নিজেরা বেশ চলে আসে! আর আমাদের মন-কেমন করলে কিচ্ছুটি করবার জো নেই!

প্রবীর কহিল—আমার জন্য তাহলে তোমার মন-কেমন করতো?

গাল ফুলাইয়া আব্দারের ভঙ্গীতে রাণু কহিল—না! করতো না!

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। খেলাঘরের ছোট মোটরে বসিয়া সামনের কম্পাউণ্ডে রাণু টহল দিতেছিল। প্রবীর বসিয়াছিল একখানা ইজিচেয়ারে। মাথা টিপ্ টিপ্ করিতেছে…চোখ জ্বালা করিতেছে… না থামিয়া বায়ু-বেগে মোটর চালাইয়া এতখানি পথ আসা…

হঠাৎ হাত টিপিয়া প্রবীর নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল।

নীলিমা আসিয়া কহিল—কি দেখছেন? অসুখ করেছে?

প্রবীর কহিল—অসুখ ঠিক নয়। কেমন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

নীলিমা কহিল—তাহলে আজ যাওয়া হবে না। হতে পারে না।

প্রবীর কহিল,—কাকেও না বলে চলে এসেছি। কেউ আমার উদ্দেশ জানে না; দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়বে।

নীলিমা বলিল—একখানা টেলিগ্রাম করে দিলে সে-দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

কথাটা সত্য। প্রবীর মনে-মনে সেই কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সকলে কি ভাবিবে? রাচিতে আসিবে যদি তো সে-কথা বলিয়া আসিলেই পারিত!…তার উপর ম্যানেজার শিবচরণবাবু সেদিন যেন ইঙ্গিত-আভাসে বলিয়াছিলেন, ও-বাড়ীর সঙ্গে এতখানি মাখামাখির জন্য পাড়ায় একটা গুঞ্জন রটিয়াছে। হাজার হোক পল্লীগ্রাম …বিধবা তরুণী…লোকের মন অশিক্ষার বিষে ভরিয়া আছে…

প্রবীর সে কথা কেয়ার করে নাই। লোকের বাজে কথায় কাণ

দিতে গেলে দুনিয়ার গতি থামিয়া যাইবে! অলস মূঢ় কাপুরুষের দল... কদর্য্য মন লইয়া দুনিয়ায় এরা শুধু কালি ছিটাইতেই জানে!...

তা নয়...

নীলিমা কহিল—যাওয়া হবে না। যেতে আমি দেবো না।...তারপর এতখানি পথ গিয়ে যদি অসুখ বাড়ে?

প্রবীর কহিল—অসুখ হবে না। পথের হাওয়ায় এ ভাব কেটে যেতে পারে।

নীলিমা কহিল—সে-ভাব এখানকার হাওয়ায় কাটিয়ে তবে আপনি যাবেন...

মোহিনী আসিল, কহিল—টিফিন-ক্যারিয়ারে লুচি-তরকারী ভরে দিলুম। আর দিলুম ঘন ক্ষীর, মিষ্টি...

নীলিমা কহিল—ত্যাখো তো মোহিনীদি, ওঁর নিশ্চয় জ্বর হয়েছে, ভাই। আমি এসে দেখি, বসে বসে হাত টিপে নাড়ী দেখছেন...

উদ্বেগে মোহিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—দেখি...

মোহিনী কপালে হাত রাখিল। ঠিক জ্বর না হোক, জ্বর-ভাব! কহিল,—মাথা ধরেছে···ত্নটো রগ্ একেবারে দপ্-দপ্ করছে। না, এতে যাওয়া হতে পারে না।

প্রবীর কহিল—কিন্তু না গেলে নয়!

মোহিনী কহিল—একটি দিন থেকে যান। আমি যদি সারিয়ে দিতে পারি, কি দেবেন বলুন তো?

প্রবীর কহিল—বর দেবো···

প্রবীর হাসিল।

মোহিনী বলিল—কল্পতরু হয়েছেন, দেখছি! কি বর দেবেন?

প্রবীর কহিল—সুন্দর বর।

মোহিনী বলিল—বরের কামনা আমার নেই। বর আমি চাই না।

—বর চান্ না? প্রবীরের স্বরে বিস্ময়!

—না।

—তবে কি চান, বলুন?

মোহিনী বলিল—ভেবে-চিন্তে সে এক সময় বলবো'খন!...আগে আপনাকে সুস্থ করে দি তো...

মধুকে ডাকিয়া মোহিনী ডিসপেন্সারিতে পাঠাইল ক'টা ওষুধ আনিতে। প্রবীরকে বলিল—আপাততঃ একটু হট্-বাথের ব্যবস্থা করি... ব্যস্...আর কিছু না!

হাসিয়া প্রবীর কহিল—রোগ সারাতে পারবেন না।

মোহিনী বলিল—ও-ভয় কাকে দেখাচ্ছেন? দু' জোড়া হাত আছে। এক জোড়া হাত রোগকে জোরে চেপে ধরবে; আর-এক জোড়া হাত রোগের ঘাড় ধরে রোগকে বিদায় করে দেবে!

প্রবীর কহিল—বেশ, তাহলে আমি আত্মসমর্পণ করলুম—কার হাত-যশ কতখানি, পরীক্ষা হোক্!...যদি দু' জোড়া হাতই যশস্বী হয়, তাহলে দু' জোড়া হাতকেই পুরস্কারে বিভূষিত করবো...

বৈকালের দিকে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ। প্রবীর বলিল—এবারে যাত্রার উদ্যোগ করি।

মোহিনা কহিল—এতখানি অকৃতজ্ঞতা নাই বা প্রকাশ করলেন !... যদি ভালো থাকেন, তাহলে গাড়ীতে চড়িয়ে আমাদের অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন, চলুন···

প্রবীর কহিল—টেলিগ্রাম পাঠানো হলো না। সেখানে হয়তো থানায়-থানায় নিরুদ্দেশ-প্রবীরের সন্ধানে চলেছে !

হাসিয়া মোহিনী কহিল—পুলিশকে এখান পর্য্যন্ত আসতে দিন তাহলে !

প্রবীর কহিল—কেমন অস্বস্তি বোধ করছি !···হঠাৎ চলে এলুম···

মোহিনী কহিল—বেশ তো।···এখানে আরো দু দিন থেকে হঠাৎ তার পর চলে গেলেই সে হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে !...

এই মিষ্ট সরস আলোচনা প্রবীরের ভালো লাগে! সেখানে কথা কহিয়া আনন্দ নাই—কথা শুনিয়া আনন্দ নাই! তারো কণ্ঠে কথা বাহির হয় যেন মাপ কবিয়া রুটিনের লাইনে...শুধু সে-সব কথা শুনিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ছন্দ-দোলা

ফরাশডাঙ্গায় ফিরিয়া প্রথমেই দেখা শিবচরণ বাবুর সঙ্গে।

শিবচরণ বাবু কহিলেন—একটু বলে যেতে নেই, বাবা? ভাবনায় আমরা এখানে অস্থির!

প্রবীরের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল—রাঁচি ঘুরে এলুম।

শিবচরণ বাবু বলিলেন—বুঝেছিলুম!...কিন্তু...

শিবচরণ-বাবুর মন যেন কিসের ধূম-বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে! প্রবীর তাহা উপলব্ধি করিল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া সে কহিল—কি বলছিলেন কাকাবাবু?

শিবচরণ বলিলেন—ওঁদের দেখাশোনা করো, ভালো! কিন্তু ছেলেমানুষ...বোঝো না বাবা, এখানকার লোকজনের মন কতখানি ইতর!

এ-কথায় প্রবীরের মন কাঁটা হইয়া উঠিল।...তার মনে স্পষ্ট কিছু না ঘটিলেও অস্পষ্টভাবে মাঝে-মাঝে একটু যে কুয়াশা-রেখার উদয়

হয়, মনে হয়, তাহাতেও যেন ইতরতায় ছোপ্ লাগিয়া আছে! কেন এমন মনে হয়?...বোধ হয়, আদিম-সংস্কার!

মনের সে-দিকটা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রবীর কহিল—তার মানে?

শিবচরণ কহিলেন,—মানে, তুমি ছেলেমানুষ...তারাশঙ্কর বাবুর স্ত্রীরও বয়স বেশী নয়...

বুকের মধ্যে কক্কড় শব্দে যেন বজ্রনাদ উঠিল!...প্রবীরের মুখে সে বজ্রাগ্নির ঝাঁজ ফুটিল।

প্রবীর কহিল—এ-সব কথা কারা বলে কাকাবাবু?

শিবচরণ কহিলেন—তারা মানুষ নয়, মানি।...কিন্তু এ সব ইতর জনরবে ওঁদের অনিষ্ট হতে পারে।

প্রবীর ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর কহিল,—কারো কোনো অনিষ্ট হবে না, কাকাবাবু, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। পাঁচজন ইতরের কথায় যদি কান দিতে হয়, তাহলে আত্মীয়ের মমতা, বন্ধুর স্নেহ—এ জিনিষগুলো পৃথিবীতে টিঁকতে পারবে না।...

শিবচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি জানেন, একালের ছেলে!... একালের ছেলে শুধু সত্য ও ন্যায়কে মানিয়া চলে। ভীরুতা নীচতা এবং ইতরতাকে তারা ঘৃণা করে। তবে জনরবের দরুণ তাঁর মনেও যদি প্রবীরের সম্বন্ধে সংশয়-বাষ্প দেখা দিত, প্রবীরের এ-কথার সুদৃঢ় আঘাতে সে সুযোগ রহিল না, ইহাতে তিনি আরাম বোধ করিলেন।...

নিত্যকার কাজ যথারীতি চলিতে লাগিল। রাঁচির সহিত সংযোগ রহিল রাণুর নামে রাণুর উদ্দেশে চিঠির মারফৎ।

পাষাণ

সেদিন সকালে প্রবীর বসিয়া রাণুকে চিঠি লিখিতেছিল,

এবারে কত দিন না গিয়ে এখানে আছি, বলো রাণু। মন-কেমন করে। কিন্তু মনকে এবারে খুব শাসনে রেখেছি। কিন্তু শাসনে রাখলে কি হবে, মন দিন-রাত ছুটে চলেছে ঐ রাঁচিতে। সেখানে সে ফিরছে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। প্রতি-মুহূর্ত্ত বসে বসে ভাবে, তুমি এখন কি করছো···তোমার মা এখন কি করছেন,—তোমার মোহিনী-মাসিমা কি করছেন! সত্যি রাণু, তুমি যদি রোজ খুব বড় বড়-চিঠি লেখো—সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কখন তোমরা কি করছো তার খুটিনাটী কথা···ধরো, সকালে বিছানা থেকে উঠলে, উঠে মুখ-হাত ধুলে, মুখ-হাত ধুয়ে দুধ খেলে, চা খেলে, হালুয়া খেলে—খেয়ে বেড়াতে চললে—কোন্ দিক দিয়ে কতদূর পর্য্যন্ত বেড়ালে, পথে কি-কি দেখলে, কি-কি কথা বললে—তাহলে সে চিঠি আমার যে কত ভালো লাগবে, বলতে পারি না! পারো না রাণু এমন চিঠি লিখতে? রোজ বেড়াতে যাবার আগে চিঠি লিখবে—"এবারে বেড়াতে চললুম"—এই কথা লিখে চিঠি শেষ করবে! তাহলে চমৎকার হয়। আমিও এমনি চিঠি লিখবো।

লিখবো কেন,—আজ থেকেই লিখি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো তোমাদের কথা! তোমরাও এতক্ষণে উঠেছো! আমার মন আকুল অধীর...

কলম থামিল। তার পর?...

কলমের মুখে কেবল আসে নীলিমার কথা। নীলিমা···নীলিমা! .. নীলিমা আমার কথা ভাবে আমার মতো?···কি ভাবে?...

সহসা দ্বারের বাহিরে সুনীতির কণ্ঠস্বর—প্রবীরদা···

প্রবীর চমকিয়া উঠিল। সুনীতি!···কহিল,—এসো সুনীতি···

সুনীতি আসিল। তার মুখ-চোখ উচ্ছ্বসিত!...যেন খুব কাঁদিয়াছে!

প্রবীর কহিল,—কি খপর সুনীতি?

একটা কম্পিত-নিশ্বাস সুনীতি রোধ করিতে পারিল না। সবলে অধরে হাস্য-রেখা আঁকিয়া সুনীতি কহিল—এলুম। কেন, আসতে নেই ?…

প্রবীর কহিল—হঠাৎ ?

সুনীতি কহিল,—হঠাৎ নয়।

—তবে ?

সুনীতি জবাব দিল না ; অবিচল দৃষ্টিতে প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল। প্রবীরের বিস্ময়ের সীমা নাই!

সুনীতি তার পানে চাহিয়া রহিল…অনেকক্ষণ। তারপর ডাকিল—প্রবীরদা ··

প্রবীর কহিল—বলো…

সুনীতি কহিল,—এ কথা সত্যি ?

—কি কথা সুনীতি ?

সুনীতি কহিল—তুমি…

কথা বাধিয়া গেল। সুনীতি মুখ নামাইল।

প্রবীর কহিল,—আমি কি… ?

আর একটা নিশ্বাস!…সুনীতি বলিল,—লোকে তোমায় যা-তা বলে…কেন তারা বলবে ?…

দুঃখে-রাগে-অভিমানে স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। সুনীতি নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রবীর বুঝিল। সমাজ-সংসারের যেটুকু জানিয়াছে…তা ছাড়া তার নিজের মনে অহরহ এই যে চিন্তা…ইঙ্গিত বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বুঝিলেও মুখে সে কিছু বলিল না, সুনীতির পানে চাহিয়া রহিল।

সুনীতি বলিল—ওদের আমি খুব শুনিয়ে দিয়েছি…পাশের বাড়ীর ঐ হেরম্ববাবু আর তাঁর বোন! গায়ে পড়ে কেন এ-সব কথা বলতে আসবে? যত বিশ্রী ছোট লোক!…আমার খালি কান্না পাচ্ছে। রাত্রে কেবল কেঁদেছি!…

প্রবীরের মনে কাঁটার ঘন কেয়ারি! প্রবীর কোনো জবাব দিল না।

তার পর দুজনেই নীরব। এ নীরবতা শেষে প্রবীরের অসহ্য বোধ হইল। প্রবীর ডাকিল,—সুনীতি…

সুনীতি কহিল—কেন?

প্রবীর কহিল—এই কথার জন্য তুমি কেঁদেছো!…বড্ড ছেলেমানুষ তুমি…

সুনীতি কহিল—না প্রবীরদা…তুমি জানো না! ওদের সে-সব কথার জন্য আমার মনে কি যে হয়েছে…কাল রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নি।

প্রবীর কহিল—তাই সকালেই এখানে ছুটে এসেছো!…ঘুমোবে? বেশ, ঘুমোও ঐ বিছানায়…

সুনীতি কহিল—ঠাট্টা করো না প্রবীরদা। ঠাট্টার কথা নয়…

প্রবীর কহিল—কিসের কথা, বলো?

সুনীতি চুপ করিয়া রহিল।

মৃদু হাস্যে প্রবীর কহিল—কিসের কথা তবে?

সুনীতি কহিল—জীবন-মরণের কথা।

কথাটা বলিবা মাত্র সুনীতি লজ্জা বোধ করিল।

প্রবীর হাসিল, হাসিয়া কহিল—বাড়ীতে বসে বসে রাজ্যের নভেল-

নাটক পড়ে' বেশ কথা শিখেছো, দেখছি যে! আচ্ছা, বসো...আমি চিঠি লিখছি...চিঠিখানা শেষ করে ফেলি...

সুনীতি বলিল—কাকে চিঠি লিখচো প্রবীরদা? রাঁচির মাসিমাকে?

প্রবীর কহিল,—না, রাণুকে।

সুনীতির বুকের মধ্যে একটা নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সুনীতি বলিল—তুমি চিঠি লেখো। আমি বাড়ী যাই···

—হঠাৎ?

—হুঁ···পাগলের মতো কেন যে ছুটে এসেছিলুম, জানি না। আর কোনো দিন আসবো না।

প্রবীর স্তম্ভিত! সুনীতির এ-চাঞ্চল্যের কারণ?···

কারণ জানিতে পারিল সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া।

শিবচরণ বাবু বলিলেন—কৈলাস বাবু এসেছেন...তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিশেষ দরকার আছে।

প্রবীর কহিল—তাঁকে বাইরে বসিয়ে রেখেচেন কেন? এখানে··· আচ্ছা থাক, আমি বাইরের ঘরে যাচ্ছি।

প্রবীর আসিল বাহিরের ঘরে। শিবচরণ বাবু আসিলেন সঙ্গে।

কৈলাস চাটুয্যে স্পষ্ট ভাবেই কথাটা পাড়িলেন, বলিলেন—তোমার বাবা ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু! দুজনে এক সঙ্গে পড়াশুনা, খেলাধুলা···

তারপর তোমার মার সঙ্গে আমার স্ত্রীর যে সম্পর্ক ছিল…অর্থাৎ দু' পরিবারে হৃদ্যতা আর অন্তরঙ্গতার সীমা ছিল না!…সে সব আজ যেন পুরাণ-ইতিহাসের কথা, বাবা…

এমনি ভূমিকার শেষে তিনি বলিলেন,—সুনীতিকে তোমার হাতে দেবার জন্য আমরা অধীর হয়ে আছি। সুনীতিকে তুমি জানো। যদি মনে করো তোমার অযোগ্য হবে না…

প্রবীর এ-কথা কখনো ভাবে নাই! কথাটা তাকে রীতিমত চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রবীর কহিল—কিন্তু…

শিবচরণ বাবু বলিলেন—এর মধ্যে 'কিন্তু' থাকতে পারে না প্রবীর…

প্রবীর কহিল—আপনারা বুঝবেন না…মানে, দুদিন আমাকে ভাববার সময় দিন।

কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন—দুদিন কেন, চার দিন, সাত দিন, ছ'মাস ভাবো! তুমি কিন্তু যতই ভাবো বাবা, সুনীতিকে তোমায় নিতেই হবে! তোমার বিষয়-সম্পত্তির লোভে এ কথা বলতে আসিনি…আমাদের দু' পরিবারের চিরদিনকার সম্পর্ক ধরেই আমি এ-কথা তুলেছি! এই শিবচরণ জানে, তোমার বাবার সঙ্গেও এ সম্বন্ধে আমার অনেক দিন কথা হয়েছে। এবং সে ভরসা [illegible]রছিলুম বলে তোমার যোগ্য হতে পারে, এমনিভাবেই সুনীতিকে আমরা মানুষ করেছি।

প্রবীর কহিল—বেশ, আমাকে সময় দিন। এর মধ্যে অযোগ্যতার কোনো কথা নেই! তবে অন্য কোনো-কিছু…মানে…

কথাটা অসংলগ্ন এবং অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

কৈলাস চাটুয্যে কহিলেন—বেশ, দুদিন পরেই তুমি বলো...কিন্তু এটুকু জেনে রেখো, তুমি ভিন্ন সুনীতির গতি নেই...

শিবচরণের পানে চাহিয়া কৈলাস চাটুয্যে কহিলেন—অন্য পাত্রের হাতে সুনীতিকে দেবো—সুনীতি তা মানবে না! মেয়ে বড় হয়েছে··· ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে!...অন্য পাত্রের নামে সে তার মাকে যে-কথা বলেছে...

তিনি আবার প্রবীরের পানে চাহিলেন, বলিলেন,—সুনীতি তাহলে বিয়ে করবে না!...ডাগর মেয়ে...জোর করতে পারি না...বিশেষ এ ব্যাপারে!

কথার শেষে কৈলাস চাটুয্যে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।...

সে রাত্রিটা কি করিয়া কটিল···প্রবীরের মনে চিন্তার সীমা নাই!

এমন করিয়া মনের সঙ্গে সে কোনো দিন হিসাব-নিকাশ করিতে বসে নাই। আজ হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া দেখিল, অন্যায় হোক, অবৈধ হোক, সারা মন জুড়িয়া বসিয়া আছে নীলিমা···নীলিমা··· নীলিমা!

বিধবা...তাহাতে কি? জীবনকে কোনো দিন সত্য করিয়া যে পায় নাই, জীবনে যার দারুণ শূন্যতা...তার সে-জীবনকে যদি সে পূর্ণ সার্থক করিতে চায়...

পাষাণ বনিয়া গিয়াছিল! আজ সে-পাষাণে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে!

তার উপর মেলামেশার মধ্য দিয়া যে-পরিচয় পাইয়াছে...রাণুকে উপলক্ষ করিয়া এই যে চিঠি লেখা...আলাপে-ভাষ্যে প্রাণ-মনের যে নিগূঢ় তথ্য...

একটা মানুষের জীবন! কাঠের পুতুল নয়...কুকুর-বিড়ালও নয়! মানুষের গড়া ছুটো বিধির নাগপাশে বাঁধিয়া পিষিয়া ফেলিবে? এমন জীবনকে পায়ে মাড়াইয়া চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে?

না...

প্রবীরের মনে এই যে আকুলতা···সারাক্ষণ সান্নিধ্য-কামনা করিয়া এই যে অধীরতা···নীলিমাকে পাশে পাইলে তার জীবন যেমন শান্ত নিরাময় স্বচ্ছন্দ হইবে, নীলিমার জীবনও তেমনি প্রাণময় হইবে! তাছাড়া রাণু! পিতার স্নেহ-মমতায় রাণুর জীবনকে ফুলের মতো স্বাভাবিক শ্রীতে বিকশিত করিয়া তুলিবে!

সুনীতি অযোগ্য নয়! কিন্তু তার মন চায় নীলিমাকে। নীলিমা তার মনকে কমনীয় ছাঁদে রচিয়া তুলিয়াছে! নীলিমা···নীলিমা তার মনের আসনে বসিয়া আছে···

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

না

অশান্ত মন লইয়া প্রবীর চঞ্চল...অধীর।

বেলা প্রায় ন'টা।

বেহারি আসিয়া হাজির। কহিল—মায়ের খুব অসুখ। রাঁচি থেকে আজ সকালে সব ফিরে এসেচেন।

ফিরিয়া আসিয়াছে···নীলিমা? অসুখ লইয়া?

আর কোনো কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই! প্রবীর তখনি ছুটিল নীলিমার গৃহে।

দোতলায় উঠিতে মোহিনীর সঙ্গে দেখা। উৎকণ্ঠা-ভরে প্রবীর প্রশ্ন করিল—ওঁর অসুখ না কি?

মোহিনী কহিল—ভাবনার কারণ নেই। হিষ্টিরিয়া...মন একেবারে অবসন্ন...melancholia...

—তার মানে?

মোহিনী কহিল—আপনাকে তাই খপর পাঠিয়েছিলুম। আপনাকে সব কথা বলবো···কিন্তু ওঁর সামনে নয়।

প্রবীর স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল!

মোহিনী কহিল—যান, গিয়ে দেখা করুন। চুপ করে বসে আছেন...

—রাণু?

—নীচের বাগানে খেলা করছে। আমি স্নান করে এখনি আসছি···

প্রবীর আসিল নীলিমার ঘরে।

নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়া আছে...আবার সেই পাষাণ-প্রতিমা!

প্রবীর কহিল—হঠাৎ চলে এলেন যে?

নীলিমা হাসিল। ম্লান হাসি। কহিল—নির্ব্বাসনে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে?

—নির্ব্বাসন!

—নয়? আপন-জন ছেড়ে, সব ছেড়ে আপনাকে যদি এমন থাকতে হতো!...দেখেছি তো...ওখানে গিয়েই যাই-যাই করতেন! আর আমি সেখানে আছি ক'মাস? কেউ থাকতে পারে?

কথাগুলার মধ্যে খুব সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হইল না!

প্রবীর কহিল—আপন-জনরা তো সঙ্গে ছিল! রাণু, মোহিনীদিদি, দীনেশবাবু।...আর কাকে চাই, বলুন?

কথাটা বলিয়া প্রবীর হাসিল। নীলিমার দু'চোখে কালিমা আর-একটু নিবিড় হইল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নীলিমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

প্রবীরের মনে পুলক-স্পন্দন! সে যেমন নীলিমার সান্নিধ্য কামনা করিতেছে অহরহ···নীলিমাও কি তেমনি···

প্রবীর কহিল—আমি আজ রাঁচি যাবো, ঠিক করেছিলুম।...

কালই যাচ্ছিলুম,···হঠাৎ কাজে পড়ে যাওয়া হলো না। কাল যদি বেরুতুম ?

নীলিমা হাসিল, কোনো জবাব দিল না।

প্রবীর কহিল—বলুন, যদি যেতুম, তাহলে কি হতো ?

নীলিমা কহিল—ভালো হতো ! যে-নির্ব্বাসনে আমায় পাঠিয়েছিলেন, সে-নির্ব্বাসনে কত সুখ, বুঝতে পারতেন !

প্রবীর কহিল—অন্যায় অভিযোগ ! আপনাকে আমি নির্ব্বাসনে পাঠাইনি। ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন রাণুকে···তাকে সুস্থ করবার জন্য।

নীলিমা কহিল—বেশ, আপনার রাণুকে সারিয়ে এনেছি তো··· এবার আমার ছুটী !

—ছুটী !···তার মানে ?

নীলিমা কহিল—আমার আর ভালো লাগে না। আমার মন পাথর হয়ে আছে···দয়া করে' আমাকে আপনারা ছুটী দিন !

প্রবীরের বুকে যেন তীর বিঁধিল ! প্রবীর কহিল—জীবনে কে কাকে ছুটী দিতে পারে, বলুন ? তাছাড়া জীবনে কারো ছুটী মেলে না ! জীবন তো অফিসে চাকরি-করা নয়···

নীলিমা কহিল—আমি তো জানি, জীবন শুধু চাকরি-করা···

প্রবীর কহিল—বেশ, এ সব কথা পরে হবে'খন ! এখন বিশ্রাম করুন। এতখানি পথ এসেছেন···

নীলিমা কহিল—আপনি বুঝি চলে যাবেন ?

—তার মানে ?

—কাজ-কর্ম্ম আছে তো···

নয়! নীলিমা মিনতি-ভরে বলিত, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই,—আমায় ছুঁটে দাও!

সদাই মলিন-মুখ…কোনো কাজে মন নাই, উৎসাহ নাই। শুধু ভালো থাকিত যেদিন রাণুর নামে প্রবীরের চিঠি গিয়া পৌঁছিত!…

তারপর এই পাঁচ ছ'দিন আগে…হঠাৎ নীলিমার প্রবল জ্বর হইল। জ্বরের ঘোরে অনেক কথা বলিত। মোহিনী থাকিত পাশে-পাশে সকল সময়ে…

যে-সব কথা বলিত, তার মধ্যে বড় কথা—প্রবীরকে উদ্দেশ করিয়া! কখনো মিনতি-ভরে আত্ম-সমর্পণ…কখনো মার্জ্জনা চাহিয়া বিদায়ের অনুমতি-প্রার্থনা ইত্যাদি!

জ্বর সারিলে মোহিনী একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল, বিধবা-বিবাহের কথা। একাগ্র মনে নীলিমা সে কথা শুনিল…নিজে কোনো কথা বলে নাই। তাই মোহিনীর ইচ্ছা…

প্রবীর কহিল—আমি এ-কথা ভেবেছি—বিশ্বাস করবেন? কাল সারা রাত।…আপনি জানেন না, আমি জানি! আমি দেখেছি জীবন্ত মানুষ নয়—পাষাণ! যেন পৃথিবীর কেউ নন্! তারপর এই চোখে আমি দেখেছি, কোন্ শূন্যলোক থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসছেন!… বুঝেছি, অনেক ব্যথায় অনেকখানি নৈরাশ্যের যাতনায় পাষাণ হয়েছিলেন …অপ্রীতি, অকরুণার আঘাতে মন পাথর হয়ে গিয়েছিল!…ওঁর যদি আপত্তি না থাকে…তাই হবে। দুজনেই সুখী হবো। আমি ওঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করি…কতখানি…

মোহিনী বলিল—পৃথিবীতে উনিও শুধু আপনাকে জানেন!…

নীলিমার জ্বর বাড়িল। টেম্পারেচার ১০৪। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন। বলিলেন—এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না...

রাত্রি প্রায় দুটো। রোগীর শিয়রে বসিয়া মোহিনী ও প্রবীর। মাথায় আইস-ব্যাগ চাপাইয়া মোহিনী বসিয়া আছে···প্রবীর সামনে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে···

নীলিমা চোখ মেলিয়া চাহিল...প্রবীরের চোখের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিল। হাতখানা প্রসারিত করিয়া নীলিমা কহিল—হাত...

প্রবীর নীলিমার হাত ধরিল···যেন আগুন !

প্রবীর কহিল—কিছু বলবেন ?...

প্রবীর একবার চাহিল মোহিনীর পানে...তারপর আবার নীলিমার পানে।

আর্ত্ত কাতর স্বরে নীলিমা কহিল—ধরে থাকুন···বড্ড ঝড়···নাহলে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বিকারের ঘোর !

প্রবীর কহিল—ভয় নেই। আমি ধরে আছি···

—হ্যাঁ, ধরে থাকুন...হাত ছাড়বেন না...

নীলিমা চক্ষু মুদিল। দু'হাতে দৃঢ়ভাবে প্রবীরের দু'হাত ধরিল।··· প্রবীরের সর্ব্ব দেহ রোমাঞ্চে কণ্টকিত।...

নিস্তব্ধ ঘর। ব্যাগের মধ্যে গুঁড়া বরফগুলোকে মোহিনী মাঝে-মাঝে নাড়িয়া ঠিক করিয়া লয়···

এক ঘণ্টা কাটিল। চাপা গলায় মোহিনী কহিল—টেম্পারেচারটা নেওয়া দরকার।···দেখি···

বরফের ব্যাগ রাখিয়া মোহিনী থার্ম্মোমিটার আনিতে গেল···

নীলিমা চোখ মেলিল, বলিল,—সত্যি কথা ?

স্বর বড় মৃদু···

প্রবীর তার মুখের কাছে মাথা আনিল, কহিল,—কি সত্যি কথা ?

নীলিমা কহিল—বিধবার বিয়েতে কোন দোষ নেই ?

প্রবীরের শরীরের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া মাথায় উঠিল···

প্রবীর কহিল—না, দোষ নেই।

নীলিমা কহিল—আমাকে বিয়ে করলে আপনি হীন হবেন না ?

প্রবীর কাঠ ! কোনোমতে কহিল—না।

নীলিমা একদৃষ্টে প্রবীরের পানে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া-চাহিয়া আপন-মনে বলিল—সব মিথ্যা হয়ে গেছে। আমার দোষ ছিল না !··· আপনার বিশ্বাস হয় ?

চোখে কি ভয়, কি সংশয় ! মমতায় প্রবীরের বুকখানা দুলিয়া উঠিল।

প্রবীর কহিল—বিশ্বাস হয়।

—আঃ !

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নীলিমা আবার চক্ষু মুদিল।

দু'মিনিট পরে মোহিনী আসিয়া বলিল—জ্বরটা দেখি...

নীলিমা চোখ চাহিল। দু' চোখে রাজ্যের প্রশ্ন !

মোহিনী কহিল—একবার ওঁর হাতটা ছেড়ে দিন। ভয় নেই...

নীলিমা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—মোহিনী... ?

—হ্যাঁ। থার্মোমিটার দেখবো।

—ছাখো।

নীলিমা হাত ছাড়িল।

মোহিনী টেম্পারেচার দেখিল—১০৩। প্রবীরকে থার্মোমিটার দেখাইল।

মোহিনী বলিল—আইস-ব্যাগ বন্ধ রাখবো না! আপনি বরং একটু শুয়ে পড়ুন মেঝেয় ঐ কার্পেটের উপর।

প্রবীর কহিল—থাক্‌গে। রাত আর কতটুকুই বা বাকী!

শেষ রাত্রিটা নীলিমা ঘুমাইল—বেশ স্বচ্ছন্দ আরামে। জ্বর কমিতেছিল।

পাঁচ দিনে নীলিমা সারিয়া উঠিল। এ ক'দিন জ্বরের জোর ছিল না—জ্বরের ঘোরে প্রবীরকে যে-কথা বলিয়াছিল, ক'দিন তেমন কথা তার ভাষায় বা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল না।

আরো দু-তিনদিন পরে প্রবীর এ-কথা তুলিল।

নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রবীর বলিল—কি কথা এত ভাবেন, বলতে পারেন ?

উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া নীলিমা কহিল—কিছু না!

প্রবীর কহিল—আপনি বলবেন না, কিন্তু আমি জানি।

ডাগর দুটি চোখ মিনতিতে ভরা। নীলিমা কহিল—কি ?

প্রবীর কহিল—সে-রাত্রে যে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আছে ?

নীলিমা বলিল—কি কথা ?

প্রবীর কহিল—বিধবা-বিবাহে দোষ নেই। আমার সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, কেউ হীন হবো না। অতএব…

নীলিমার মুখ পাণ্ডু বিবর্ণ হইল। মনে যে-কথা অহরহ জাগিতেছে—যে-কথাকে পা দিয়া মাড়াইয়া-পিষিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নীলিমা প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছে…সে-কথা পাছে মর্ম্মরিয়া ওঠে, এই ভয়ে নীলিমা সারাক্ষণ নিজেকে সকলের পিছনে একান্ত অন্তরালে রাখিয়া দুঃসহ বেদনা ভোগ করিতেছে…প্রবীরের কাছে রোগের ঘোরে সে-কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে ?

কি বলিয়া প্রবীরের সামনে এখন মুখ তুলিয়া চাহিবে ? লজ্জায় নীলিমা মুখ নামাইল…

প্রবীর কহিল,—জবাব দিন…

নীলিমার বুকের উপর দিয়া যেন একদল ফৌজ সদর্পে অভিযানে চলিয়াছে…

প্রবীর কহিল—অভয় পেয়ে অকপটে আমি আজ বলছি, আমি আপনাকে ভালোবাসি…

নীলিমাকে কে যেন সবলে লাঠি মারিল…বাঁকিয়া নুইয়া মাথা যেন মাটীতে মিশিয়া যাইবে !

প্রবীর কহিল—আপনি আমায় ভালোবাসেন ? বলুন…

কোনমতে পাতালের অতল-তল হইতে নীলিমার স্বর জাগিল,—না ..

—আমাদের বিয়ে হতে পারে···

—না !

—আপনার কথা না ভাবেন, রাণুর জন্য··· ?

—না !

প্রবীর বলিল,—আমার নিত্যদিনের এত আশা···

নীলিমার তবু সেই এক উত্তর,—না !

প্রবীরের মনে হইল, মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সে যেন কোন্ অতল অন্ধকূপে পড়িয়া গিয়াছে ! চারিদিকে অন্ধকার...রাশি-রাশি অন্ধকার !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মর্ম্মকথা

প্রথম যৌবনের প্রণয়-স্বপ্ন!

সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে বড় বেদনা লাগে। পৃথিবী যেন এক নিমেষে মিথ্যা হইয়া যায়। মন কোথাও আশ্রয় পায় না, অবলম্বন পায় না...

প্রবীরের তাই হইয়াছে! দু' দিন, দু' রাত্রি সে ঘরে পড়িয়া রহিল ...ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না...কোথাও গেল না...কাহারো সঙ্গে দেখা করিল না।

শিবচরণ আসিয়া বলিলেন—অসুখ করেছে?

—না।

—তবে।

প্রবীর বিরক্ত হইল। কহিল,—যদি একটু চুপচাপ থাকি, আপনাদের তাতে এত কিসের আপত্তি হবে, বলতে পারেন কাকা-বাবু?

শিবচরণ কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

—

বাহিরে কৈলাস চাটুয্যে আসিয়া বসিয়া ছিলেন, কহিলেন—কোনো আশা-ভরসা পেলেন ?

গম্ভীর মুখে গম্ভীরতর কণ্ঠে শিবচরণ বলিলেন—না। এ কথা তুলতে পারলুম না। বললে, আমায় একটু চুপচাপ থাকতে দিন।

কৈলাস চাটুয্যে চিন্তামগ্ন রহিলেন।

শিবচরণ বলিলেন—আপনিও দুদিন চুপচাপ থাকুক…

নিশ্বাস ফেলিয়া কৈলাস চাটুয্যে বলিলেন,—অগত্যা।…

আরো দুদিন পরে প্রবীর আসিল শিবচরণের ঘরে, ডাকিল,—কাকাবাবু…

শিবচরণ কতকগুলা হিসাবের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন—এসো প্রবীর…

প্রবীর আসিল…বিমর্ষ মলিন মুখ।

শিবচরণ কহিলেন,—কি বলবে, বলো…

প্রবীর কহিল,—কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিন কাকাবাবু। আমি একবার বেড়াতে বেরুবো . ঘরের কোণে পড়ে থেকে-থেকে মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। বাঁচতে হবে তো…

শিবচরণ কহিলেন,—বেশ, ব্যবস্থা করছি। কবে যাবে, কিছু ঠিক করেছো ?

প্রবীর কহিল—যেদিন আপনি অনুমতি দেবেন। আজ অনুমতি পাই, আজই বেরুবো···না হয় কাল, কিম্বা পরশু···

শিবচরণ বলিলেন,—আজ-কাল হয় না। একটু সময় দাও...পাঁজিতে একটা ভালো দিন দেখি···

মৃদু হাস্যে প্রবীর কহিল,—জীবনে এত দেখে এত শুনে এখনো পাঁজির উপরে বিশ্বাস রাখেন কাকাবাবু ?

শিবচরণ বলিলেন—বয়স যত বাড়ছে, মন ঐ পাঁজিকে ততই আঁকড়ে ধরছে বাবা...

—বেশ, আপনার পাঁজি থেকেই একটা দিন আমায় দেখে দেবেন। তবে যত শীগগির হয়...দেরী হলে পাঁজি না মেনেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

চৈত্র মাস। বসন্তের শ্যামল শ্রী দিকে দিকে মাধুরী-হিল্লোল বহাইয়া দিয়াছে···

প্রবীর ভাবিল, রাণু...তাকে একবার দেখিয়া আসি। নীলিমাই বা কেমন আছে। পাওয়ার দিকটা ভাঙ্গিয়া গেছে বলিয়া সম্পর্ক শেষ করিয়া দিবে ?

ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিল।

প্রবীর পথে বাহির হইল।...

ঐ সে পাথর-পুরী···বন্দিনী রাজকন্যার বন্দিশালা।

প্রবীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সামনে ছিলেন দীনেশবাবু...

কহিলেন,—এই যে প্রবীরবাবু! আসুন...আমরা কাল সকলে তীর্থে চলেছি।

তীর্থে! প্রবীর বিস্মিত হইল।

দীনেশ কহিল,—নীলিমার হুকুম। এখানে মন টি঺কছে না...বলছে, দূরে চলো, অনেক দূরে...

প্রবীর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনেশ কহিল—আপনি ক'দিন আসেন নি...অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

—না।

দীনেশ কহিল—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি। আপনি ভিতরে যান...

প্রবীরের কোনো চেতনা ছিল না। পা দুটো তাকে টানিয়া একেবারে ভিতর-বাড়ীর দোতলায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

প্রবীরের চমক ভাঙ্গিল। ঐ ঘর...ঐ ঘরে সেদিন শেষ কথা...

প্রবীর ডাকিল,—রাণু...

সে আহ্বানে নীলিমা ছুটিয়া বাহিরে আসিল...

এ ক'দিনে নীলিমা এ কি হইয়া গিয়াছে! বর্ণ মলিন...দেহ কৃশ... এ যেন নীলিমার কঙ্কাল!

নীলিমা কহিল—আপনি এসেছেন!

বলার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা ভয়ে যেন কাঁটা হইয়া গেল!

প্রবীর কহিল—আমি চলে যাচ্ছি...তাই একবার এসেছিলুম সে কথা বলতে...

নীলিমা কাঠ হইয়া রহিল···

প্রবীর কহিল—অনেক দূরে যাবো। কবে ফিরবো, জানি না।... রাণু কোথায়?

—মোহিনীদি তাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে...নৌকোয় করে'...

—ও···আচ্ছা, তাহলে আসি···

প্রবীর ফিরিল।

ভাবিয়াছিল, নীলিমা হয়তো বসিতে বলিবে। নীলিমা তা বলিল না।

প্রবীরের বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে!

হঠাৎ নীলিমা কহিল—একটু দাঁড়াবেন?

প্রবীর ফিরিল। কহিল—কিছু বলবেন?

নীলিমা কহিল—হ্যাঁ।···আমি এখনি আসছি।

নীলিমা চলিয়া গেল।

প্রবীর দাঁড়াইয়া রহিল···সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা। নীলিমা কি বলিবে?

চকিতে মনে হইল, গল্পে-উপন্যাসে যেমন পড়িয়াছে, শেষ-বিদায়ের সময় নীলিমা হয়তো বলিবে, তাই হোক—যা বলিয়াছিলে...

ক্ষণে-ক্ষণে আকাশের রঙ বদলাইতেছে!

নীলিমা ফিরিল। কহিল—এইটে পড়বেন···বাড়ী গিয়ে।···যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, সব বুঝে ক্ষমা করবেন।

খামে-মোড়া মস্ত চিঠি। খামের উপরে লেখা—প্রবীর বাবু

দূরে গঙ্গার ঘাটে কে নৌকা-মেরামত করিতেছিল...হাতুড়ি-পেটার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ...

প্রবীর কহিল—আর কোনো কথা নেই ?

নীলিমা কহিল—যা-কিছু কথা ছিল, ওতেই লেখা আছে।...দয়া করে পড়বেন...

বাষ্পোচ্ছ্বাসে নীলিমার চোখ ভরিয়া উঠিল। সে-চোখের সামনে পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাষ্প-ভার কাটিয়া চোখের সামনে পৃথিবী যখন আবার জাগিয়া দেখা দিল, প্রবীর তখন চলিয়া গিয়াছে।

চিঠি নয়! যেন খাঁচার মধ্যে বন্দী একরাশ পাখী! খাঁচা খুলিলে কল-কাকলী তুলিবে, না, কি করিবে! দীনেশ বলিল, সকলে তীর্থে চলিয়াছে!...এ যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে প্রবীরের অজ্ঞাতে!

পৃথিবীর আলোর উপর মেঘের পর্দা নামিতেছে!

চিঠি লইয়া প্রবীর বাড়ী ফিরিল। ফিরিয়া নিজের ঘরে আসিল।

ঘরে আসিয়া চিঠি খুলিল। মাঝে মাঝে কালির লেখা চুপ্সিয়া উঠিয়া গিয়াছে...নিশ্চয় চোখের জলে!

প্রবীর চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

বন্ধু

কোন্ কথা দিয়া কোথা হইতে লেখা সুরু করিব, বুঝিতে পারিতেছি না! সব কথার আগে সব কথা ঠেলিয়া একটা কথা বড় হইয়া বুকে জাগিতেছে! সে কথা—না! আমার ভাগ্যে সুখ নাই...এ-কথা মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়ো।

'তুমি' বলিলাম—এই প্রথম···এবং বোধ হয় এই শেষ! বন্ধু বলিয়া ডাকিলাম—জন্মাবধি প্রাণে যে আগুন জ্বলিয়াছে—'বন্ধু' বলিয়া ডাকিলে আগুনের সে-জ্বালা যেন কম বোধ হয়! কিন্তু কতক্ষণের জন্য?

মনে যে-কথা বড়-গোপন রাখিব ভাবিয়াছিলাম, রোগের ঘোরে সে কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই! এত বড় লজ্জা বহিয়া তোমার সামনে দাঁড়াইতে আমার মাথা কাটা যাইবে! নিজের মন যখন আমার এত বড় শত্রু, তখন বন্ধু আমাকে কি সুখে সুখী করিবে? অসম্ভব! সে দুরাশা!

তা নয়। যে-কথা বলিয়াছি, সে কথা রাখিব, এমন সাহস, এমন অধিকার আমার নাই! কেন, আজ বলি।

গরীবের ঘরে আমার জন্ম। তবু মন গরীব ছিল না। মনে ছিল অনেক সাধ, অনেক আশা। তা ছাড়া এ-মনে যে-সম্পদ ছিল, তার দাম রাণীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদের চেয়ে কোনো

দিন কম মনে করি নাই! মনের সে সম্পদের জোরে পৃথিবীকে কোনো দিন কদর্য্য ভাবি নাই, জীবনকে দুগ্র্হ ভাবিয়া অভিশাপ দিই নাই!

কিশোর বয়স। সংসারের দারুণ দুর্দ্দিনে প্রবীণ ধনীর সঙ্গে বাবার দেখা। ধনীর খেয়াল, বাবাকে বড় দায়ে রক্ষা করিল। তারপর আমাকে দেখিল! আমাকে দেখা মানে, আমার দেহটাকে দেখিল···আমার প্রথম-বয়সের রূপটাকে দেখিল! যাহা লইয়া মানুষ মানুষ...মন...সে-মনটাকে দেখিল না। মনকে ক'জন দেখিতে পায়? কিন্তু সে কথা যাক্।

তার অনেক টাকা। টাকার জোরে আমাকে আনিল বাবার কাছ হইতে নিজের সংসারে। বাবা দারিদ্র্য-দুঃখ পাইয়াছিলেন। ভাবিলেন, টাকার জোর থাকিলে পৃথিবীতে কোনো দুঃখই মানুষকে দুঃখ দিতে পারে না! মেয়ের পয়সার দুঃখ ঘটিবে না, শুধু এটুকু ভাবিয়া বাবা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যার হাতে আমাকে দিলেন, তার মন আছে কি না, থাকিলেও সে-মন কেমন, সে লোকের বয়স, স্বভাব—এগুলার পানে বাবা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন না! আমি নিঃশব্দে নিজেকে এ যজ্ঞে আহুতি দিলাম। বাবার কষ্ট ঘুচিয়াছে—ইহা ভাবিয়াই আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তারপর গহনা-কাপড় দাস-দাসী ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মাথায়

চড়িয়া আমি আসিলাম প্রৌঢ় স্বামীর ঘরে। বয়সে প্রৌঢ় বলিয়া দুঃখ ছিল না! বাঙালী-ঘরের মেয়ে…স্বামীর বয়স লইয়া বিচার করিতে শিখি নাই।

কিন্তু দুঃখ যা পাইয়াছি, সে-স্বামীর বয়সের জন্য নয়! সে-দুঃখের কারণ বলিতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

স্বামী সুরাপান করিতেন,—জীবনকে অনাচারের কালি মাখাইয়া কালো করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। যে-নারীকে বিলাসের জন্য যখনই কামনা করিয়াছেন, পয়সার জোরে তাহাকে আনিয়া নিজের বিলাস চরিতার্থ করিয়াছেন। নারী ছিল তাঁর হাতে খেলার পুতুল…যতক্ষণ-খুশী, লইয়া খেলা করিয়াছেন, খেলার শেষে সে-পুতুল ফেলিয়া নূতন পুতুল সংগ্রহ করিয়াছেন! এতকাল বিবাহ করেন নাই কেন? বলিতেন, বিবাহে কোনোকালে তাঁর রুচি নাই!

ক্ষমা করিয়ো। এ সব কথা লিখিতে আমার লজ্জা হইতেছে, অথচ না লিখিলে আমার দুঃখ বুঝাইতে পারিব না।…আমার দুঃখ না বুঝিলে সেদিন কি করিয়া তোমার মুখের উপরে 'না' বলিয়াছি, তাও তুমি বুঝিবে না! তুমি তা না বুঝিলে আমার মনের গ্লানিতে তিলে-তিলে আমি জর্জ্জরিত হইব! জ্বালা বাড়িবে বৈ কমিবে না!…

স্বামী এ-সব কথা বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। একদিন বলিয়াছিলাম—আমাকে তুমি কেন বিবাহ করিলে? হাসিয়া স্বামী বলিয়াছিলেন…

পাষাণ

যে-কথা বলিয়াছিলেন, নিজের স্ত্রীকে কেন, বার-নারীকেও মানুষ বোধ হয় তেমন কথা বলিতে পারে না!

এক-কথায় আমার দেহে-মনে যা কিছু ছিল সুন্দর-সুমধুর, নির্ম্মল-শুভ্র-অনাবিল, স্বামীর ভোগ-বিলাসের মত্ততায় সে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। আমার বয়স তখন আঠারো বৎসর।

এ বয়সে এতখানি দুর্ভাগ্য কোন্ নারী সহিয়াছে, বলিতে পারো? আমি ছিলাম যেন স্বর্গের পারিজাত! স্বামীর লালসার আগুনে সেই-আমি হইলাম নরকের কীট! নিজের উপরে ঘৃণা জন্মিল! নিজেকে মনে হইত...

কিন্তু সে কথা যাক।

তারপর রাণু কোলে আসিল। স্বামীর প্রমত্ততা তবু কমিল না! সুরার নেশায় যে-কাণ্ড করিতেন,···ইচ্ছা হইত, তখনি মরি। কিন্তু রাণুর মুখ চাহিয়া সে-অপমান সহিয়া বাঁচিয়া রহিলাম!

রাণু তখন দু' বছরের মেয়ে। তার খুব অসুখ। তাকে লইয়া একা যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি। আমার শক্তি শুধু দেবতার চরণ! পড়িয়া পড়িয়া তাঁকেই ডাকিতেছি···

নেশায় মত্ত-মাতোয়ারা স্বামী আসিয়া যে-কীর্ত্তি করিল—লোকে বলে, স্বামী-নিন্দা পাপ! কিন্তু সে-আচরণের চেয়ে বড়-পাপ আমি ভাবিতে পারি না।

অর্থাৎ তিনি বলিতেন, পুরুষের কাছে নারীর শুধু একটি

মাত্র পরিচয়, সে-পরিচয় নারী পুরুষের বিলাস-সঙ্গিনী... গণিকা...সম্ভোগের সামগ্রী!

সেদিন আমার প্রত্যাখ্যানে স্বামী আমায় অকথা বলিলেন, কুকথা বলিলেন। সব সহ্য করিলাম শুধু রাণুর মুখ চাহিয়া। বলিয়াছি তো মেয়েকে লইয়া তখন যমের সঙ্গে যুদ্ধ চলিয়াছে!

স্বামী রাগিয়া মেয়েকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সে কি মূর্ত্তি! সে-মূর্ত্তি মনে পড়িলে আজো আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠি!

খাটের উপরে মেয়ে রাণু...জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ! কামান্ধ স্বামী আমার উপর শোধ লইতে আক্রোশ-বশে কি করিলেন, জানো?

মেয়ের বিছানায় মুখের জ্বলন্ত সিগার ছুড়িয়া দিলেন। ভগবান সহায় ছিলেন, সে সিগার পড়িল গিয়া খাটের কোণে।

ঘরের কোণে ছিল টেবিলের উপর বড় ফুলদানী। পিতলের ভারী ফুলদানী। স্বামী সেই ফুলদানী তুলিয়া রাণুর দিকে তাগ করিলেন...ছুড়িবেন বলিয়া! আমি ঝাঁপাইয়া স্বামীর উপরে পড়িলাম।

সে কি যুদ্ধ! তাঁর হাত হইতে ফুলদানী পড়িয়া গেল। স্বামী বলিলেন,—গলা টিপে মেরে ফেলবো। এতটুকু পুঁচকে মেয়ে...দেখি, তার কত বড় প্রাণ!

স্বামীর সে মার-মূর্ত্তি! আমার চোখের সামনে যেন

আগুনের রক্ত-শিখা জ্বলিয়া উঠিল। প্রাণপণে স্বামীকে প্রতিরোধ করিলাম!

টানাটানি করিতে করিতে ঘর ছাড়িয়া আসিলাম সিঁড়ির উপরে বারান্দায়। তখন অনেক রাত। লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই। তারপর ঘরে আসিয়া আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিতে গেলাম। স্বামী আসিয়া আমার কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—খুব জোরে।

স্বামীকে সবলে ধাক্কা দিলাম। তিনি সিঁড়ির রেলিঙে গিয়া পড়িলেন। টাল সামলাইতে পারিলেন না; পড়িয়া গেলেন। আমি দ্বার বন্ধ করিলাম।

দ্বারে লাথির পর লাথি। হুঙ্কার···গর্জ্জন! আমি মেয়েকে বুক দিয়া চাপিয়া চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম...

হঠাৎ বাহিরে একটা ভারী জিনিষ-পড়ার শব্দে কাঁটা হইয়া উঠিলাম। চোখ বুজিয়া এক-মনে ডাকিতে লাগিলাম, ঠাকুর, আমার রাণুকে রক্ষা করো···আমার প্রাণ নিয়ে আমার রাণুর প্রাণ রাখো...

আমার চেতনা ছিল না।

ভোরের বেলায় পুরোনো খানশামা আসিয়া ডাকিল,—মা, মা।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। সে বলিল,—সর্ব্বনাশ হয়েছে মা। বাবু নেই।

আমার বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

আসিয়া দেখি, সিঁড়ির নীচে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন আমার স্বামী...আমার দেবতা...আমার জীবনের দুর্গ্রহ...দেহ-মনের অভিশাপ! দেহে প্রাণ নাই। মাথায়-মুখে রক্তের দাগ!

ডাক্তার আসিল...পুলিশ আসিল...

কি করিয়া দিনগুলো কাটিল, জানি না। আমি যেন আচ্ছন্নের মতো ছিলাম!

হঠাৎ একদিন চেতনা ফিরিল। দেখি, আমার রাণু বসিয়া খেলা করিতেছে। সে সারিয়া উঠিয়াছে। আমি বিধবা।

শুনিলাম, আমার খুব অসুখ গিয়াছে। সাত দিন সাত রাত অচেতন ছিলাম। ডাক্তারেরা বলিলেন, শক্!

মনে মনে হাসিলাম!

এই আমার পরিচয়!...তারপর যদি মন আমার পাথর হইয়া গিয়া থাকে, মনের কি অপরাধ, বলো?

মনের সে-পাথর সরিয়াছে সেদিন, যেদিন তুমি আসিয়া স্নেহ-মমতায় ভরা দৃষ্টি লইয়া সামনে দাঁড়াইলে। তারপর সুখে-দুঃখে আমার মন আবার জাগিল! এতদিনকার পাথর-সরা মন আবার যেন তার প্রথম-কিশোরের স্বপ্ন-সুষমায় ভরিয়া উঠিল...

মনকে নিবৃত্ত করিয়াছি,—না, না। তা হয় না! যে-ফুল

এ খপরের অবলম্বনটুকু যেদিন হারাইব, সেদিন আর বাঁচিব না।

যদি কখনো শোনো, আমি নাই—রাণুকে কাছে আনিয়ো। তার ভার তোমার উপরে রহিল। শুনিয়াছি তীর্থে-তীর্থে দেব-দর্শন করিলে শান্তি মেলে। ইহলোকে শান্তির আশা আমার নাই। তীর্থের ঠাকুরদের পায়ে মিনতি জানাইব, দুর্ভোগ যেন এ-জীবনের সঙ্গে শেষ হয়—এর জের পর-জন্মে যেন'আর ভোগ করিতে না হয়!

শেষকালে একটি কথা...মিনতি...অনুরোধ...

আমাকে ভুলিবে, এত বড় কথা আমি বলিতে পারিব না! আমাকে মনে রাখিয়ো। তবে আমার জন্ম সন্ন্যাসী হইয়া থাকিয়ো না। বিবাহ করিয়ো।

আমি জানি, কৈলাসবাবুর মেয়ে সুনীতি...তোমার জন্য ওঁরা তপস্যা করিতেছেন। বিশেষ সুনীতি। কদিন সুনীতি আসিয়াছিল...আমি আনিয়াছি শুনিয়া আমাকে দেখিতে! আমাকে কি ভালোই বাসে...

কথায় কথায় আভাসে জানিয়াছি, তুমি তার সব। দয়া করিয়া সুনীতিকে বিবাহ করিয়ো...আমাকে যদি সত্যই চাও, সুনীতির মধ্যেই আমাকে পাইবে। তাকে বুকে ধরিয়া তার মুখে অজস্র চুমু দিয়া তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, সুখী হও বোন, তোমার সুখ দেখিলে এ-জীবনে আমি সত্যকার সুখে সুখী হইব! আরো বলিয়াছি, তোমাকে যেন সে সুখী করে!

ঝরে, সে আর বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না! তার সব শেষ হইয়া যায়!...

কিন্তু মনকে নিবৃত্ত করার শক্তি নাই! সেদিন জ্বরের ঘোরে মনের সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না। তার উপর তোমার সে-মিনতি...

কত ব্যথায় 'না' বলিয়াছি, 'না' বলিয়া আরো কত-ব্যথা পাইয়াছি, কেহ তা বুঝিবে না...

এখানে দাসী-চাকরের মুখে অপবাদ-কলঙ্কের কথা শুনিয়াছি। পৃথিবী কি জায়গা, সে-পরিচয় এ বয়সে যা পাইলাম, বলিবার নয়!

তোমার নির্ম্মল অক্ষত জীবন...আমার সঙ্গে তোমার জীবনের সংযোগ হইতে পারে না। দুজনের মাঝখানে মস্ত ব্যবধান। আমার পরাক্রান্ত পতিদেবতার সে-স্মৃতি···আগুনের সাগর!! এ-সাগরে সেতু রচনা করা চলে না।

আমাকে মার্জ্জনা করিয়ো। এখানে বড় প্রলোভন। তাই চলিয়া যাইতেছি। এখানে আছে সমাজ-সংসার। পুণ্যের সমাজ—পুণ্যের সংসার। মনে পড়ে কবির লেখা সেই গান

সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না—
কারেও সে ধরে রাখে না···
হেথা যে যায় সে যায়···

যেখানেই থাকি, খপর দিব। তুমিও খপর দিয়ো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

একা

সন্ধ্যার সময় গৃহে আর থাকা গেল না। বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে...আকাশ যেন ঊর্দ্ধলোক হইতে ক্রমে পৃথিবীর বুকের উপরে নামিয়া আসিতেছে.. যেন জাঁতার মতো বুকে বসিয়া পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিবে!

বাড়ীর বাহির হইয়া প্রবীর ভাবিল, নীলিমার কাছে যাইবে।

মন বলিল, না...নিজের কল্যাণের জন্য নীলিমা দূরে চলিয়াছে... আবার তাকে দড়ি দিয়া বাঁধিবে?

না।...তার চেয়ে...

সুনীতি! ঠিক! সুনীতি গিয়াছিল নীলিমার কাছে,—নীলিমাকে সুনীতি এত ভালোবাসে।...দুজনে কি কথা হইয়াছে?

পা দুটো তাকে কৈলাস চাটুয্যের গৃহে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। কৈলাস চাটুয্যে গৃহে ছিলেন, বলিলেন—এঁরা গেছেন তারাশঙ্কর বাড়ী। তারাশঙ্করের স্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছিলেন...

ও! প্রবীর একা, আজ একা...পাশে গিয়া দাঁড়াইবে, এমন কেহ

চিরদিন দূরে থাকিব, এমন পণ আমার নাই। আমি মানুষ—তোমাকে না দেখিয়া বেশীদিন দূরে থাকিতে পারিব মনে হয় না। তবে যদি শুনি, তুমি সুনীতিকে বিবাহ করো নাই, তাহলে এ-জন্মে আর ফিরিব না—তোমার সামনে এ-মুখ লইয়া কোনোদিন দাঁড়াইব না।

নীলিমা

এত ঝড় তোমার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! হায়, দুর্ভাগিনী! প্রবীর স্তম্ভিতের মতো বসিয়া রহিল!